কুড়িয়ে ছড়িয়ে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বংকিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

ন' টাকা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৩

বেংগল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ও মানসী প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট কলিকাতা। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক ও মুদ্রণ—ভারত ফোটো টাইপ স্টুডিও, বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

শ্রীউদয়ন চট্টোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু—

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সূচী

সেঁজুতি

স্টোভ্‌টা আর না বাতিল করলে নয়। পাম্প করতে করতে হাতে ব্যথা ধরে যায়। কোন রকমে যদি বা তারপর ধরে তবু থেকে থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ করে' এমন দপ্‌ দপ্‌ করে' ওঠে যে ভয় করে।

সত্যি ভয় করে? বাসন্তীর মনে প্রশ্নটা ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌তে না উঠতেই স্বামী শশীভূষণ মাঝখানের দরজাটা একটু ফাঁক করে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে—'কি' গো এখনো চা হ'ল না? তোমার চা খাওয়াতে ওদের ট্রেন ফেল করিয়ে ছাড়বে নাকি?'

'তা হ'লই বা ট্রেন ফেল। জলে তো আর পড়েনি। একটা রাত আমরা জায়গা দিতে পারব।'

শশীভূষণ এবার আরো একটু ব্যস্ত ভাবে ঘরেই এসে দাঁড়ায়। 'না, না, তুমি বুঝতে পারছ না....'

শশীভূষণকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বাসন্তী একটু ঝঙ্কার দিয়েই বলে, 'বুঝতে খুব পারছি কিন্তু কি করব বল। দুটো বই দশটা হাত ত আর নেই।'

শশীভূষণের এতক্ষণে স্টোভটার দিকে দৃষ্টি পড়ে। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-ভাবে সে বলে, 'তুমি আবার এই স্টোভ বার করেছ!'

'বার করব না ত করব কি? একটা উনুনে এত তাড়াতাড়ি সব কিছু হয়?'—শশীভূষণের দিকে চেয়ে তারপর একটু হেসে সে বলে—তোমার অতিথিকে শুধু চা দিয়ে ত আর বিদেয় করতে পারি না।'

কথাটায় প্রচ্ছন্ন একটু খোঁচা ছিল কি না কে জানে!

শশীভূষণের দৃষ্টি কিন্তু তখনও স্টোভটার দিকে। চিন্তিত ভাবে বলে, স্টোভটা কিন্তু না জ্বাললেই পারতে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এদিকে তাড়াতাড়িও চাই আবার স্টোভ ধরালেও ভাবনা। যাও তুমি ততক্ষণ গল্প করগে যাও দেখি! আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু তার আগে আমিই না এসে পারলাম না। আচ্ছা এসব হচ্ছে কি বলুন ত বৌদি?' মল্লিকা এসে বোধ হয় জুতো পায় থাকার দরুণ চৌকাঠের ওপারেই দাঁড়ায়।

মল্লিকার সঙ্গে আলাপ পরিচয় অনেক্ষণ হয়েছে, তবু বৌদি ডাকটা একেবারে নতুন। বাসন্তীর উত্তর দিতে তাই বোধহয় একটু দেরী হয়। মল্লিকার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সে বলে,—'কি আর হচ্ছে ভাই। কিছুই ত পারলাম না।'

মল্লিকা জুতোটা খুলে এবার ঘরেই এসে বাসন্তীর পাশে বসে পড়ে। "আহা শুধু মাটিতে বসলে কেন,' বলে' বাসন্তী একটা আসন তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয়।

আসনটা সরিয়ে রেখে মল্লিকা বলে 'থাক্ শুধু মাটিতে বসলে আমার মান যাবে না। কিন্তু আপনি যে রীতিমত কুটুম্বিতে সুরু করে দিলেন। তবু যদি নিজে থেকে খোঁজ করে না আসতে হত।'

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলে,—'সে দোষ ত ভাই আমার নয়।'

এতক্ষণ নাগাড়ে পাম্প দেওয়ার পর ষ্টোভটা ধরে উঠেছে। চায়ের কেৎলিটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাসন্তী উঠে পড়ে, বলে—'আমায় কটু রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে ভাই। আপনারা বসে ততক্ষণ গল্প করুন।'

বাসন্তী উঠে চলে যায়। মল্লিকা মাথা নীচু করে' বসে থাকে। শশীভূষণ আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক কি করা উচিত বুঝতে পারে না। ষ্টোভের সাইলেন্সারটাও খারাপ। তার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ

বেশ একটু অস্বস্তিকর।

মল্লিকা মাথা নীচু করেই হঠাৎ ঈষৎ চাপা গলায় বলে,—'এভাবে এসে বোধহয় ভালো করিনি।'

কথাগুলো আরো মৃদুস্বরেই মল্লিকা বুঝি বলতে চেয়েছিল। ষ্টোভের আওয়াজের দরুণ গলাটাকে একটু বেশী চড়াতে হয়। মনে হয় কথাগুলো যেন উঁচু পর্দ্দায় ওঠার দরুণই খানিকটা মর্য্যাদা হারায়, কেমন যেন একটু সুলভ হয়ে পড়ে।

'না, না, খারাপ আবার কিসের?' শশীভূষণ কেমন একটু আড়ষ্ট ভাবেই জবাব দেয়। কিন্তু জবাবটা ঠিক এভাবে মল্লিকা আশা করেনি। এবার শশীভূষণের মুখের দিকে চোখ তুলে সে বলে, 'কেন যে এতদিন বাদে এ খেয়াল হ'ল নিজেই জানি না, অথচ এই লাইনে আরো দু-তিনবার গেছি। গাড়ী বদলাবার জন্যে ষ্টেসনে অপেক্ষাও করেছি চার পাঁচ ঘণ্টা। তখনও জানতাম তোমরা এখানেই আছ।'

শশীভূষণ কোন জবাব দেয়না।

ষ্টোভটা হঠাৎ দপ্ দপ্ করে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নেবে যায়। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই মল্লিকা একটু সরে বসে' পাম্প দিতে আরম্ভ করে। ষ্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ আওয়াজটায় সমস্ত ঘর ভরে যায়।

হঠাৎ শশীভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আরে আরে করছ কি? অত পাম্প দিও না।'

পাম্পটা থামিয়ে মল্লিকা শশীভূষণের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে—'কেন?'

'মানে, ষ্টোভটা অনেক দিনের পুরোণ, খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ ফেটে যেতে পারে।'

শশীভূষণের চোখে পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি রেখে মল্লিকা বলে 'তাহলে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারী হয়,—না' ?

শশীভূষণ কেমন একটু সঙ্কুচিত ভাবে চোখটা সরিয়ে নেয়।

মল্লিকা কিন্তু চোখ না নামিয়েই আবার বলে,—'তোমার স্ত্রী মানে বৌদি ত এই ষ্টোভই জ্বালেন ?'

শশীভূষণ অন্যদিকে চেয়েই বলে,—'না, খারাপ হয়ে গেছে বলে এটা ব্যবহারই হয় না। আজ কেন যে বার করেছে কে জানে।'

'ও' বলে', মল্লিকা এবার মাথা নীচু করে' খানিকক্ষণ চুপ করে' থাকে।

হঠাৎ শশীভূষণ চমকে উঠে বলে—'ও কি হচ্ছে কি ? বলছি পাম্প দিও না বিপদ হতে পারে।'

ষ্টোভের আওয়াজের দরুণ শশীভূষণকে কথাগুলো বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয়। বাসন্তী তখন রান্নাঘর থেকে বড় একটা থালা হাতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে,—'বিপদ আবার কি হ'ল ?'

মুখ ফিরিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে মল্লিকা সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলে—'দেখুন ত বৌদি ! আপনার ষ্টোভে একটু বেশী পাম্প দিলেই নাকি বিপদ হবে ! ষ্টোভটা কি অতই খারাপ নাকি ?'

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার তাকায়, তারপর রান্নাঘর থেকে আনা গরম খাবারের থালাটা ছোট টেবিলটার উপর রেখে বলে,—"খারাপ হতে যাবে কেন ? ওঁর ওই রকম অদ্ভুত ধারণা। একটু পুরোণ হলেই বুঝি ষ্টোভ অচল হয়ে যায় !'

'আমিও তাই বলি', মল্লিকা সমানে ষ্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেটলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জ্জন করে' চারিধারে যেন ফণা তোলে।

যেন ফণা তোলে।

শশীভূষণ কি বলতে গিয়ে যেন বলতে পারে না। কেমন একটু ভীত অসহায় ভাবে বাসন্তীর দিকে তাকায়। বাসন্তী তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ শশীভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাসন্তী একটু হেসে—মল্লিকার পাশে বসে পড়ে, ষ্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে বলে,—'থাক ভাই থাক, আর দরকার নেই। দুদণ্ডের জন্যে দেখা করতে এসে অত খাটলে আমাদের যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। আপনি ওঘরে গিয়ে বসুন, আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি আপনার ভাই বোধ হয় এতক্ষণ একা একা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।'

মল্লিকা সব কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সে বলে,—'আপনি বোধহয় ভয় পাচ্ছিলেন যে ষ্টোভটা আমি ফাটিয়েই দিলাম।'

'না ভয় পাব কেন? ফাটবার হ'লে ও ষ্টোভ অনেক আগেই ফাটত!' বাসন্তী গলার স্বরটা তারপর পাল্টে বলে,—'আপনাকে কিন্তু সত্যিই এবার উঠে ওঘরে যেতে হবে। এমনিতেই অতিথি সৎকারের যথেষ্ট ত্রুটী হয়ে গেছে।'

'না. আপনি লৌকিকতার চরম করে ছাড়লেন।' বলে' মল্লিকা এবার পাশের ঘরে চলে যায়।

ষ্টোভের আওয়াজটা পাশের ঘরেও বেশ প্রচণ্ড। তবে একেবারে অত দুঃসহ নয়। মল্লিকার পায়ের শব্দ তাই বোধ হয় শশীভূষণ শুনতে পায় না। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর চমকে মুখ তুলে তাকায়। তারপর কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলে,—'তোমার ভাই আবার একটু ঘুরে বেড়াতে গেল। ট্রেণের সময় হয়ে যাবে বলে

ভয় দেখালাম,—তবু শুনল না।'

'তা' যাকগে। তোমার ভয় নেই। সীন আমরা কিছুতেই কেল করব না।'

কথাটা কোনরকম ঝাজ না দিয়েই মল্লিকা বলে। তারপর শশীভূষণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকিয়েও পারে না। শশীভূষণ কি এ কথারও একটা উত্তর দিতে পারে না?

শশীভূষণ কিন্তু নীরবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মল্লিকার ইচ্ছে হয়, হঠাৎ চীৎকার করে বলে,—'তোমার ভয় নেই, ভয় নেই।' পাঁচ বছর বাদে আজ হঠাৎ তোমার সংসারে ভাঙন ধরাব বলে আমি আসিনি। তবে আগুন অনেক দিন নিভে গেলেও একটা দুটো স্ফুলিঙ্গ হয়ত এখনো আছে নির্লজ্জের মত এই আশাই করেছিলাম।'

এসব কিছুই সে বলে না অবশ্য। নিতান্ত সহজভাবেই সাধারণ আলাপ করবার চেষ্টা করে,—'তোমার এখানকার চাকরী তো প্রায় চার বছর হল—না?'

'হ্যা, প্রায় তাই।'

'ভালো লাগে এইরকম মফস্বল শহরে পড়ে থাকতে?'

'না লাগলে উপায় কি? কলকাতার কোন কলেজে চাকরী পাওয়া তো সোজা নয়।'

উপায় কি? ঠিক শশীভূষণেরই যোগ্য উত্তর। এই শশীভূষণের সত্যকার চরিত্র। চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে বসে আছে। স্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই। পাঁচ বৎসর আগেও এমনি করেই সে দুর্ব্বলভাবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন এতটুকু দৃঢ়তা তার মধ্যে থাকলে হয়ত তাদের জীবনের ইতিহাস আর এক রকম হতে পারত।

কিন্তু ইচ্ছে করলে সমস্ত বাধা সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি মল্লিকাই তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারত। দেয়নি শুধু নারী সুলভ সঙ্কোচে আর লজ্জায় আর বুঝি একটু আহত অভিমানে। কি ভুলই সেদিন করেছে!

কিন্তু সত্যি ভুল করেছে কি? চকিতে এ প্রশ্ন তার মনের সমস্ত দিগন্ত যেন একটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। এই আত্মবিশ্বাস-হীন অসহায় দুর্ব্বল মানুষটির জন্যে গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্ত্ত সে নিঃশব্দে পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়েছে, কিন্তু সত্যি একে জয় করে নিলে সে কি সত্যি সুখী হ'ত? ভিজে সলতেয় সারা জীবন ধরে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশঃ একদিন দুর্ব্বহ হয়ে উঠত না কি?

স্টোভটার আওয়াজটা বড় বিশ্রী শোনাচ্ছে না?'—শশীভূষণের কথায় মল্লিকার চমক ভাঙে।

অদ্ভুত ভাবে হেসে সে বলে,—ভয় হচ্ছে নাকি! কিন্তু বৌদি ত বল্লেন স্টোভ মোটেই খারাপ নয়।'

কেট্‌লির জল ফুটে উঠে স্টোভের উপর উথলে পড়তেই বাসন্তীর যেন হুঁস হয়। কেটলিটা নামিয়ে চায়ের পটে জল ঢেলে স্টোভটা নিভিয়ে দেবার জন্যে সে চাবিটার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চাবি ঘোরান আর হয় না।

সত্যিই কি স্টোভটা আজ হঠাৎ এই মুহূর্ত্তে ফেটে যেতে পারে? ভাগ্যের সঙ্গে এবাজি খেলবার সাহস তার আছে কি? একদিন ছিল। সেদিন সত্যিই এই ষ্টোভটাই সে শেষ মুক্তির পথ বলে ঠিক ক'রে রেখেছিল। কেউ কিছু জানবেনা, কিছু বুঝবেনা, কোন অপবাদ কারুর গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে শুধু একটা দুর্ঘটনা হ'ল।

সেদিন অত বড় নিদারুণ সঙ্কল্প তাকে করতে হয়েছিল শুধু এই

মল্লিকার জন্তে, ভাবতে এখন তার আশ্চর্য্য লাগে। মল্লিকাকে সে চোখে দেখেনি, তার একটা ছবি পর্য্যন্ত নয়। কিন্তু এ বাড়ীতে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণে ওই একটি নাম তার দিন রাত্রি বিষাক্ত করে তুলেছে।

মল্লিকাকে সে কি ভাবেই না কল্পনা করেছে! সে কল্পনার সঙ্গে আজকে এই চাক্ষুষ পরিচয়ের এত তফাৎ হবে সে ভাবতেও পারে নি। মল্লিকাকে কুশ্রী বলা চলে না। কিন্তু সে রূপও তার নেই যাতে পুরুষের মনে অনির্ব্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারে। লেখাপড়া শেখা আধুনিক মেয়ে বলে সাজসজ্জার একটা পরিচ্ছন্নতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বয়সের ছাপটাও একেবারে আর লুকোন নেই। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ত, সুতরাং বয়স নেহাৎ কম ত হ'ল না।

স্বামীর কাছে মল্লিকার নাম সে বিয়ের পর কোনদিন শোনে নি, কিন্তু আর পাঁচজন হিতৈষী ত আছে সাবধান করবার, পরামর্শ দেবার।

ফুলশয্যার রাত্রেই তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঘরে পাঠাবার আগে আর সব মেয়েদের উদ্দেশ করে' এক ঠান্‌দি সম্পর্কীয়া প্রৌঢ়া সেকেলে অভদ্র রসিকতা করে বলছিলেন,—ওরে সাজিয়ে ত দিলি, সঙ্গে একটা শিকলি দিয়েছিস ত? নইলে ও উড়ো পাখীকে বাঁধবে কি দিয়ে?

প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে শুধু রসিকতার ধরণে বাসন্তী লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বোঝানেই যাদের আনন্দ তারা না বুঝিয়ে ছাড়বে কেন? একটু একটু করে কিছুই তার প্রায় শুনতে বাকী থাকে নি।

স্বামীর মুখে একবার আধবার মল্লিকার নাম শুনলে সে বোধ হয় অতটা আহত হত না যতটা হয়েছে তাঁর আপাতঃ নির্ব্বিকার নীরবতায়। কতদিন বিছানায় স্বামীকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখে তার বুকের

ভেতরটা জ্বালা করে উঠেছে। হয়ত—হয়ত কেন নিশ্চয়ই স্বামী এখন মল্লিকার কথাই ভাবছেন।

মল্লিকাই যদি তোমার দিবারাত্রির ধ্যান ত আমায় বিয়ে করতে গেছলে কেন?—ইতরের মত ঝগড়া করে একথা বলতে পারলে বুঝি খানিকটা বুকের জ্বালা কমত। কিন্তু তার বদলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে চলে গেছে।

শশীভূষণ খিল খোলার শব্দে একটু চমকে জিজ্ঞাসা করেছে—'যাচ্ছ কোথায়?'

'বাইরে বারান্দায় যাচ্ছি।'

ব্যস্ আর কিছু বলবার দরকার হয়নি। হঠাৎ বারান্দায় যাবার কোন কারণই স্বামী জানতে চাননা। তাঁর কোন কৌতূহলই নেই। বাসন্তীর মনে হয়েছে যে সে যদি বলত, গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছি? তাহলেও স্বামী বোধহয় শুধু একটু 'ও' বলে নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে থাকতেন। অসহ্য অসহ্য এই নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য, এর চেয়ে স্পষ্ট অপমানও ঢের ভালো ছিল।

একদিন এই ষ্টোভের সামনে বসেই তাই তার মনে হয়েছে, কি ক্ষতি হয় সব একেবারে শেষ করে দিলে। শাশুড়ি তখনও বেঁচে। তাকে ষ্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে দেখে খানিক আগেই তিনি সাবধান করে গেছেন,,—'ও ষ্টোভটা তুমি কেন আবার জ্বালতে গেলে বৌমা? ওটা খারাপ হয়ে গেছে বলে আমি কাউকে ছুঁতেই দিই না। দেখো বাপু ফেটে টেটে আবার একটা কেলেঙ্কারী না হয়।'

ফেটে গিয়ে কেলেঙ্কারী! হ্যাঁ এরকম দুর্ঘটনা খুব নতুন নয়। বাসন্তী প্রাণপণে ষ্টোভটায় পাম্প দিয়েছে। কোন দুর্ঘটনাই কিন্তু ঘটেনি।

তারপর ধীরে ধীরে কবে থেকে যে সব বদলে গেছে, বাসন্তী ঠিক স্মরণ করতেই পারে না। কিন্তু ক্রমশঃই তার মনে হয়েছে, এই একান্ত অসহায় পরনির্ভর মানুষটি, এক পা যে তার সাহায্য বিনা চলতে পারে না, নিজের অসুখটা পর্য্যন্ত যার বাসন্তীর কাছে জেনে নিতে হয়, গভীর কোন ভালবাসা তার মনে চিরন্তন হয়ে আছে এ কি বিশ্বাস করবার যোগ্য ? যার মনের হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপার আজ বাসন্তীর কাছে জলের মত স্বচ্ছ, এমন কোন আশ্চর্য্য গোপন স্থান তার কোথাও কি থাকতে পারে যেখানে অত বড় ভালবাসা নিঃশব্দে গোপন করে রাখা যায়! কোনদিন কোন রঙ যদি শশীভূষণের মনে লেগে থাকে বাসন্তী স্থির বিশ্বাসে জানে যে সে রঙ অনেক আগেই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

একদিন সে নিজেই তাই মল্লিকার কথা তুলেছে স্বামীর কাছে।

'ওগো এখানের গোকুলপুরের মেয়েদের স্কুলে নতুন কে হেড্‌ মিস্ট্রেস্‌ হয়েছেন জান ? তোমাদের সেই মল্লিকা রায়।'

মল্লিকা সম্বন্ধে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে আলাপ এই প্রথম। তবু বাসন্তীর কথায় বা কথার ধরণে শশীভূষণের কোন ভাবান্তরই চোখে পড়ে না। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই সে বলে 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

এতটা নির্লিপ্ততা বুঝি বাসন্তীও আশা করে নি। সে আবার একটু খোচা দেবার জন্যেই বলে, 'আমাদের এই জংশন ষ্টেশনেই ত গাড়ি বদল করে যেতে হয়। একবার আসতে বলো না কেন ?'

'কি জন্যে ?' শশীভূষণ যেন একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে,

'কি জন্যে আবার ! একবার একটু দেখতাম।' বলে' বাসন্তী সেখান থেকে চলে গেছে।

শশীভূষণ আসতে অবশ্য বলেনি। মল্লিকা আজ এতদিন বাদে নিজে থেকেই এসেছে। না, সত্যিই কোন জ্বালা, কোন সংশয় বাসন্তীর

মনে আর নেই। সে বরং খুসী হয়েছে মনে মনে। তার এই পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনই মল্লিকাকে সে এনে দেখাতে চেয়েছিল। যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে এ যেন তারই ঋণ শোধ।

ওঘরে বসে এখনো ওরা গল্প করছে। কি গল্প করছে কে জানে? যাই করুক কিছু আসে যায় না। বাসন্তী জানে তার কোন ভয় আর নেই।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে স্টোভটা কি ফেটে যেতে পাবে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বাসন্তী চমকে ওঠে। কি ভাববে তাহলে মল্লিকা? কি ভুল ধারণাই না সে করতে পারে! অনায়াসেই ভাবতে পাবে এই নিদারুণ নাটকীয় পরিণামের সেই বুঝি মূল। বুঝি সে আসাতেই বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ!

না, না, এ মিথ্যে গৌরবের সুযোগ কিছুতেই মল্লিকাকে দেওয়া যায় না। ষ্টোভটা নেভাবার জন্যে বাসন্তী চাবিটাকে ঘোরাতে যায়। হঠাৎ চাবিটা এত এঁটে গেলই বা কি করে? বাসন্তী সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটা ঘোরাতে পারে না। হঠাৎ ভয় পেয়ে তার মনে হয় শশীভূষণকে ডাকবে কিনা! কিন্তু, না সে বড় লজ্জার ব্যাপার। তা হ'লেও মল্লিকার কাছে মান থাকে না।

ষ্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মত হিংস্র গর্জ্জন করছে। উঠে কোথাও সরে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পারে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কিছুতেই—কিছুতেই আজ কোন দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।

স্বর

সন্ধ্যে সাতটায় কম্প দিয়ে জ্বর এল।

লেপ কাঁথা যেখানে যা ছিল চাপা দিয়েও সে কাঁপুনি থামান যায় না। একটা প্রচণ্ড উন্মত্ত আলোড়ন শুধু যেন শরীর নয়, সমগ্র সত্তার অন্তঃস্থল থেকে উদ্দাম হিমশীতল তরঙ্গের পর তরঙ্গ সমস্ত চেতনা ক্ষণে ক্ষণে আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছে।

এক মুহূর্ত্তে সব কিছু গেল বদলে। কোন ধারাবাহিকতা আর নেই চেতনার।

জীবনের একটি নিটোল চমৎকার দিন যেন টুকরো টুকরো হয়ে, ভেঙে ছড়িয়ে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মিশে।

শেড-দেওয়া আলোয় প্রায়ান্ধকার একটি ঘর ক্রমশঃ যেন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। নমিতার একটা ঠাণ্ডা হাত মাথার ওপর থেকে বহুদূর যাচ্ছে সরে। দেওয়ালে অদ্ভুত সব ছায়ার নক্‌সা যেন জীবন্ত হয়ে চলাফেরা করছে। উড়ে যাওয়া মেঘের মত একটা মশারীর চাল হঠাৎ মুখের উপর এল নেমে। পাশের বাড়ির কর্কশ রেডিও-নিনাদ, ওধারে বারান্দায় কাদের আলাপ হয়ে উঠল।

তারি মধ্যে বয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য্য ঠাণ্ডা এক নদী, ষ্টিমারের একটু মৃদু কম্পন. নেপথ্যে প্রপেলারের একটা একঘেয়ে আওয়াজ, রেলিংএর ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়া একটি মুখ, স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন তবু কেমন যেন একটু কঠিন।

বারান্দায়ওরা আমারই কথা আলাপ করছে মনে হয়।

"আর দুদিন সবুর করলে কি এমন রাজ্যনাশ হত! এই শরীরে আজকালকার পথের এত ধকল সহ্য হয়।"

পথের ধকল? হ্যাঁ, ধকল কম নয় বটে। ষ্টিমার-ঘাটে সেই জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে সত্যি আতঙ্ক হয়েছিল। মনে হয়েছিল ষ্টিমারে সাতদিন অপেক্ষা করেও পৌঁছাতে পারব না। এত মানুষ কখন একটা ষ্টিমারে ধরতে পারে। গ্যাং-ওয়েটা যেন মানুষের ভারে ভেঙ্গে পড়বে। হরেক রকম মানুষের একটা জমাট জটলা। কুলি, ভদ্রলোক, ফৌজ, তারি সঙ্গে বিচিত্র বিপুল মালপত্রের লট-বহর।

....মাথার ভেতর একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন ধীরে ধীরে নামছে। নমিতাই বুঝি আইস-ব্যাগটা ধরে আছে। কোথায় কারা বাজারদর নিয়ে আলাপ করছে

"আগুন! আগুন! যা কিছু ছুঁতে যাও সব আগুন!"

"আর বারে গেছে চাষী-মজুর, এবার আমাদের পালা।"

"সুস্থ লোকের খাবার নেই ত রোগীর ওষুধ!"

"তবু কলকাতায় কি রকম ভীড় দেখেছ—বেড়েই চলেছে।"

....ওপরের ডেকে ওঠবার সিঁড়িটার কাছে কেমন করে পৌঁছেছিলাম, নিজেই জানি না। নিজের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নয়, সমবেত জনতার একটা নিরবিচ্ছিন্ন চাপে শুধু এগিয়ে চলেছি।

সিঁড়ির ওপরের ডেকের ফোকরটা যেন একটা হাঁ-করা বিভীষিকা। কুলিদের মাথার মালগুলো বিপজ্জনকভাবে কাৎ হয়ে আছে। ওপরে মানুষের নিরেট দেওয়াল ভেদ করে কোন দিন উঠতে পারব মনে হয় না। দুঃসহ দমবন্ধ করা গরম, তারি মধ্যে হঠাৎ চারিধারের কোলাহলটা যেন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অর্দ্ধ সচেতনভাবে বুঝতে পারলাম সমূহ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। সিঁড়ির ওপরের ধাপের একটা কুলির মাথার ওপরকার মালের পাহাড় টলে গিয়ে ধ্বসে পড়বার উপক্রম।

সরে যাবার জায়গা নেই, দুর্ব্বল হাতে সেই বিশাল সুটকেশ ট্রাঙ্কের পাহাড়ের পতন নিবারণ করা অসম্ভব। অভিভূতের মত নিশ্চেষ্টভাবে শুধু সেটি ঘাড়ের ওপর পড়বার প্রতীক্ষায় আছি, আচ্ছন্ন-ভাবে পেছনে অনেকের কলরবের মধ্যে নারী-কণ্ঠের একটা চীৎকার শুনলাম। আপনা হতে একবার চকিতে মুখটা পিছন দিকে ঘুরে গেল। একটি অদ্ভুত কম্পিত মুহূর্ত্ত....আতঙ্ক ...বিস্ময়....কেমন একটু অস্বস্তি।

পর মুহূর্ত্তে কোলাহলের তীক্ষ্ণতা আবার স্বাভাবিক খাদে নেমে এল, মালের পাহাড় কেমন করে যেন আপনা থেকেই দৈববলে সামলে গেছে, মা নিরেট দেওয়ালে একটু ফাঁক দেখা দিয়েছে।

সুটকেশটা কোন রকমে টেনে নিয়ে ওপরে গিয়ে উঠলাম।

ওপরেও সেই জনসমুদ্র। তিলধারণের জায়গা নেই। সুটকেশটি কোনরকমে পেতে বসবার একটা ফাঁক খোঁজবার জন্যে হতাশ ভাবে চারিধারে তাকাচ্ছি। পেছন থেকে আবার শুনলাম, "ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, সেকেণ্ড ক্লাস কেবিন এদিকে।"

যিনি এ সম্ভাষণ করলেন তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। মুখ থেকে তাঁক, পোষাক থেকে তাঁর সঙ্গের মালপত্র মালপত্র থেকে দাসীর কোলে ঘুমন্ত শিশু, ঘুমন্ত শিশু থেকে উর্দ্দি-পরা চাপরাশীর চেহারা পর্য্যন্ত সব কিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ হেসে বল্লাম "চল'।"

....হিম-শীতল তরঙ্গের সে প্রচণ্ড আলোড়ন থেমে গিয়ে একটা গাঢ় আচ্ছন্নতা নেমে এসেছে নিশ্চিদ্র মেঘপুঞ্জে ঢাকা আকাশের মত।

নমিতা কোথায় ছেলেদের গোলমাল করবার জন্যে শাসন করতে শুনতে পাচ্ছি। সঙ্কীর্ণ এই দু'খানি মাত্র ঘর, ছেলেরা কোথায় বা যায়। ছেলেদের গোলমালের চেয়ে পাশের বাড়ির রেডিওটা যদি কেউ থামিয়ে দিতে পারত! আর বারান্দায় ওই অবিশ্রান্ত আলাপ!

"রাস্তায় ঘাটে সত্যই ত পয়সা ছড়ান, কিন্তু কুড়িয়ে নেবারও তাকৎ চাই।"

"নেহাৎ হতভাগা না হ'লে আজকের দিনে কেউ আর বেকার নেই।"

"মানুষ হলে কেউ স্কুল-মাষ্টারি করে আজকের দিনে? তার চেয়ে রিক্সা টানলেও অনেক বেশী লাভ।"

কাকে উদ্দেশ করে যে আলাপ চলেছে তা বোঝা কঠিন নয়।

কোথা থেকে বিরামহীন একটা জল পড়ার আওয়াজ আসছে।

পাশের বাড়ির ট্যাঙ্ক ছাপিয়ে জল পড়ছে বোধহয়। শুধু এই দেশের নিরবচ্ছিন্ন স্নিগ্ধ শব্দটি যদি শুনতে পেতাম····।

ষ্টীমারে কেবিন একটিও খালি নেই। রিজার্ভ করার প্রমাণ স্বরূপ কাগজখানা মূল্যহীন। সে কাগজ দেখিয়ে ঝগড়া করবার মতও কাউকে পাওয়া যায় না। সময় বুঝে কেবিন-ক্লার্ক গা ঢাকা দিয়েছে। ষ্টীমারের সমুদ্রে কোথায় তাকে খুঁজে বার করা যাবে?

কেবিনগুলোর সামনে রেলিং-এর ধারে একটু জায়গা করে মালপত্র-গুলো জমা করে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে একটা বেঞ্চি পাওয়া গেছে বসবার মত।

"কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার বল ত!"

"খুব খারাপ হয়েছে-নাকি!"

"চেনাই যায় না।"

হেসে বল্লাম,—"চেনা নিশ্চয় যায়। নইলে চিনলে কি করে?"

"তুমি ত চিনেও এড়িয়ে যাবার মতলবে ছিলে।"

বেঞ্চিরই একধারে শায়িত ঘুমন্ত শিশুটির ওপর থেকে চাপরাশী পর্য্যন্ত সব কিছুর ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে বল্লাম, "সেটা কি খুব অন্যায়?"

বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর উত্তর এল, "হ্যা, সত্যি-ই অন্যায় !"

একটু বিস্মিত হয়েই তার মুখের দিকে তাকালাম। দু'জনের পরিচয়ের ইতিহাসে যেখানে ছেদ পড়েছিল, তার পরের কোন কথাই কেউ এ পর্য্যন্ত তুলিনি। শুধু এইটুকু জেনেছি যে, শর্ম্মিষ্ঠার স্বামী বেশ বড় দরের একজন সরকারী কর্ম্মচারী; সম্প্রতি বদলি হয়ে সেখানে গিয়েছেন, শর্ম্মিষ্ঠা পিত্রালয় থেকে শিশু-কন্যাকে নিয়ে সেখানেই রওনা হয়েছে। এতক্ষণ যে ধরণের অবান্তর আলাপ চলেছে তার মাঝখানে শুধু এই মন্তব্যটুকু নয়, তা বলবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত কেমন যেন বিসদৃশ লাগল তাই।

আমার বিস্মিত দৃষ্টিটুকু লক্ষ্য করেই বোধ হয় শর্ম্মিষ্ঠা খানিকটা মাথা নীচু করে রইল একটু যেন অপ্রস্তুত ভাবে। তার পর মৃদুস্বরে বল্লে—"আমার কথা তুমি বুঝতে পারলে না ?"

সরল ভাবে বল্লাম—"না।"

আরো বেশ খানিক্ষণ চুপ করে থেকে শর্ম্মিষ্ঠা ধীরে ধীরে বল্লে—"জীবনটা ঠিক নিপুণ লেখকের সাজানো গল্প ত নয়—একটি মাত্র জুৎসই সমাপ্তি যার লক্ষ্য সুখ বা দুঃখের একটি বিশেষ রসসৃষ্টি করেই যার ধারা যায় ফুরিয়ে।"

একটু হেসে বল্লাম —"নিপুণ লেখকের মতই বড্ড বড় কথা বলার চেষ্টা করছ নাকি !"

"সত্যিই বড় কথা ভাগ্য যখন ভাবিয়েছে তখন বল্লে দোষ কি ?"

মনে পড়ল শর্ম্মিষ্ঠা চিরদিনই একটু বেশী বড় কথা ভাবত। নিজের মাপের চেয়েও বড়। ভাগ্য তাকে বড় কথা যদি ভাবিয়ে থাকে তার মাপের চেয়ে বড় জায়গায় টেনেও তুলেছে। এবার নিজের অনিচ্ছাতেই একটু খোঁচা না দিয়ে পারলাম না।

বল্লাম —"প্রচুর অবসর আর স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে এসব বিলাস সাজে।"

শর্ম্মিষ্ঠা কিন্তু অবিচলিত ভাবেই নিজের কথার জের টেনে বল্লে—"যা হারাই তা মনে করে রাখার অনির্ব্বাণ বেদনা হ'ল বই-এর গল্পের, জীবনে তার পরেও কিছু থাকে।"

"কি থাকে ?"

"যা পেয়েছিলাম তাই মনে রাখার প্রশান্তি।"

শর্ম্মিষ্ঠার দিকে আর একবার সবিস্ময়ে তাকালাম। তার পোষাক থেকে প্রসাধনের পরিচ্ছন্ন বিশেষত্বে, তার সহজ আত্মস্থ ভঙ্গিতে বোধ হয় প্রশান্তিরই পরিচয়।

....বারান্দার আলাপের সুর এখন চড়া। নমিতার সঙ্কুচিত স্বর এই আচ্ছন্নতার ভেতর ভাল করে কানে পৌঁছোচ্ছে না, কিন্তু তার মর্ম্মটা অস্পষ্ট নয়।

"বরফ! আর বরফ পাওয়া যাবে কোথায়! আড়াই টাকা সের বরফ দশ বিশ সের কিনতে কত টাকা লাগে হিসাব আছে ? আর টাকা থাকলেই কি বরফ পাওয়া যায় ?"

কণ্ঠস্বরটা আমার শ্বশুর মশাই-এর, অকর্ম্মণ্য অক্ষম এক জামাই-এর হাতে কন্যাদান করার ভুলের জন্য নিজেকে তিনি এখনো ক্ষমা করতে পারেন নি। তাঁর অনুশোচনা নানাভাবে নানাভঙ্গিতে তাই প্রকাশ পায়।

নমিতার মৃদু কণ্ঠের মিনতির ভাষাটা পাশের বাড়ির রেডিও-নিনাদে হারিয়ে গেল। শ্বশুর মশাই-এর কণ্ঠ আবার রেডিও ছাপিয়ে উঠল—"কাজ ত হল অষ্টরম্ভা! লাভের মধ্যে খাস জংলী ম্যালেরিয়াটি বাগিয়ে নিয়ে এলেন। এমন কাজের খোঁজে সাত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার কি ছিল। বরাতে ত সেই স্কুল-মাষ্টারি।"

পাশের বাড়ির রেডিওটা সত্যিই বুঝি পাল্লা দিতে না পেরে হঠাৎ থেমে গেছে। শুধু ছাপিয়ে-ওঠা ট্যাঙ্ক থেকে ঝির-ঝির করে জল পড়ার একটা আওয়াজ। সে জলের ঠাণ্ডা শব্দ যেন কানের ভিতর দিয়ে শরীরের সমস্ত শিরায় শিরায় পেতে চাই।

নমিতা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাচ্ছি। আইস-ব্যাগটা একবার মাথার ওপর ধরে নামিয়ে নিলে। আইস-ব্যাগে বরফ আর নেই সব জল হয়ে গেছে।

চোখ না খুলেই নমিতার মুখ যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। লেপের ভেতর থেকে হাতটা বার করে তার হাতটা ধরে ফেল্লাম। ভিজে ঠাণ্ডা স্পঞ্জের মত নিষ্প্রাণ হাত—অনেকক্ষণ আইস-ব্যাগ ধরে থাকার দরুণ বোধ হয়।

আস্তে আস্তে বল্লাম,— আমার কোটটার ভেতরের পকেটটা খুজে দেখো নমিতা, টাকা আছে।

"টাকা আছে!" —নমিতার কণ্ঠস্বরে গভীর বিস্ময়। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ না সত্যি বলছি সে বুঝতে পারছে না।

....অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত কেবিন-ক্লার্কের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা কেবিনের ব্যবস্থা হ'তে পারে—তবে কিঞ্চিৎ উপরি লাগবে।

আমাকে ইতস্তত: করবার অবসর পর্যন্ত না দিয়ে শর্ম্মিষ্ঠা মণিব্যাগটা বার করে আমার হাতে তুলে দিলে।

স্বাভাবিক সঙ্কোচে বল্লাম —"তুমি গুণে দাও না ?"

"না না তোমার কাছেই থাক না এখন যাও যাও হাঙ্গাম চুকিয়ে দিয়ে এস।"

হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে এসে দেখলাম শর্ম্মিষ্ঠা কেবিনটি দখল করে ইতি মধ্যেই চাপরাশীর সাহায্যে মালপত্র তুলে সব গোছগাছ করে নিয়েছে।

গোছগাছ একটু বেশী রকম। হেসে বল্লুম—"তুমি ত একেবারে সংসার পেতে বসেছ দেখছি, অথচ একঘণ্টা বাদেই ত নেমে যাবে।"

টিফিন কেরিয়ার থেকে দুটি প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে শর্ম্মিষ্ঠা বল্লে—"এক ঘণ্টার সংসারই কি তুচ্ছ—ঘণ্টা ধরে ত সব কিছুর দাম কষা যায় না।"

খাবারের প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমায় বল্লে "নাও এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সব কথা শুনব।"

ভাবলাম বলি—আমার কথা শোনার ধৈর্য্য কি তোমার আছে শর্ম্মিষ্ঠা? যেখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল সেখান থেকে আমি অনেক ধাপ নেমে এসেছি, তুমি গেছ উঠে। আমি দরিদ্র স্কুল মাষ্টার, ব্রত বড়, নিষ্ঠা নেই। যুদ্ধের বাজারে আগুন যেখানেই লাগুক, ছাই হল আমাদের সংসার সবার আগে। তাই আজকের দিনে আলাদীনের প্রদীপ যাদের হাতে তাদের একজনের দরজায় লোভে, দুরাশায় ধন্না দিতে গেছলাম। কিন্তু তাও ভাগ্যে সইল না। জ্বরে পড়ে রুগ্নদেহ নিয়ে পুনমূ্ষিক হয়ে ঘরে ফিরছি। তুমি আমার জীবনে কবে কি ছিলে তা মনে রাখবার উৎসাহটুকুও আমার নেই!

কিছুই কিন্তু বল্লাম না—বলবার দরকার হল না। শর্ম্মিষ্ঠার নিজেরই দেখা গেল এত কথা বলবার আছে যে সময়ে কুলোয় না,—তার জীবনের গভীর, সূক্ষ্ম সব দুঃখ, আঘাত, দ্বন্দ্ব, সমস্যার কথা। সেই সঙ্গে তাদের পারিবারিক প্রসঙ্গও বুঝি না এসে পারে না,—তার স্বামীর পদমর্য্যাদা, দায়িত্ব, তাদের সাংসারিক সামাজিক প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় শর্ম্মিষ্ঠা নিজের হৃদয়কে যেন সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে চলল।

অবহিত হয়ে তার কথাই শুনছিলাম। প্লেট খালি দেখে শর্ম্মিষ্ঠা আবার অনেকগুলো খাবার চাপিয়ে দিলে। বল্লাম "করছ কি! কত আর দেবে"।

শর্ম্মিষ্ঠা গাঢ় গভীর স্বরে বল্লে—"আমার কাছে কতবড় পাওনা তোমার ছিল, তার কি-ই বা দিতে পারলাম।'

....বারান্দায় শ্বশুরমশায়ের গলার স্বরটা হঠাৎ কেমন নতুন শোনাচ্ছে।

"এ-ত একশ টাকার নোট, এখন ভাঙাব কোথায় ?"

নমিতার কণ্ঠস্বর এবার আর তত মৃদু নয়, "সব কটাই ত ওই !"

"সব কটাই। ওঃ—এতক্ষণে বুঝেছি, কিছু আজ সেখানে নির্ঘাৎ বাগিয়েছে।"

মাঝখানের একটা ষ্টেশনে শর্ম্মিষ্ঠা নেমে গেল। যথাসম্ভব সাহায্য করলাম—কুলি ডেকে মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে।

ষ্টিমার ছাড়বার আগে পর্য্যন্ত শর্ম্মিষ্ঠা পণ্টুনে রইল দাঁড়িয়ে। শেষ মুহূর্ত্তে গভীর গাঢ় স্বরে বল্লে,—"আমি কি ভাবছি জান ?"

"কি ?"

"আর যেন দেখা না হয়।"

একটু চুপ করে থেকে পকেট থেকে তাড়াতাড়ি তার মণিব্যাগটা বার করে ছুঁড়ে দিলাম।

"দেখ দিকি আর একটু হলে ভুলে যাচ্ছিলাম।"

"শেষকালে শুধু কি ওইটুকুই মনে পড়ল !"

একটু হাসলাম, ওপরে ঘণ্টা বাজছে ষ্টিমার চালাবার। প্যাডলের আলোড়নে ষ্টিমার কাঁপছে।

শর্ম্মিষ্ঠা কখন ব্যাগ খুলবে জানি না, খুল্লে আমার চিঠির টুক্‌রোটুকু পাবে নিশ্চয়। লিখেছি,—"তোমার কাছে অনেক বড় পাওনা আমার ছিল, তার সামান্য কিছু শোধ নিলাম।"

চিরদিনের ইতিহাস

নিরিবিলি দেখে হনু একটু নিশ্চিন্ত হয়ে গা চুলকোবার যোগাড় করছে, এমন সময়ে ওপরে আওয়াজ হ'ল—"হুম্, হুম্!" দিনদুপুর হ'লে কি হয়—জায়গাটা বেজায় অন্ধকার, তাই হনু প্রথমটা দেখতে পায়নি। এবার চমকে এদিক-ওদিক চেয়েই উদ্ধশ্বাসে দে লাফ। এ ডাল থেকে আর ডালে, সে ডাল থেকে একেবারে আর এক গাছে। ওঃ, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে। আর একটু হ'লেই হয়েছিল আর কি। গেছো প্যাঁচার অক্ষয় পরমায়ু হোক, দিনকাণা বলে আর কখন তাকে হনু ক্ষেপাবে না।

শিকার ফসকে চিতা চক্‌চকে ছুরির মতো চোখ তুলে একবার গেছো প্যাঁচার দিকে তাকালে। ডালটা নাগালে পেলে একবার চুকলি খাওয়ার মজাটা দেখিয়ে দিত।

কিন্তু গেছোপ্যাচা হুতুম নির্বিকার—ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্ত্তি যেন। আধবোজা চোখের তলা দিয়ে চিতার দিকে শান্ত ভাবে তাকিয়ে বল্লে—"কাজটা কি ভাল হচ্ছিল বন্ধু—বিশেষ এই দিন দুপুর বেলা?"

চিতা নীচে থেকে ফ্যাঁস করে উঠ্‌ল—"দিনদুপুর বেলা মানে? হুতুম গম্ভীর ভাবে বল্লে—"মানে আজকাল তোমরা বনের শাস্তরটাস্তর সব উল্টে দিলে কিনা! দিন রাতের বিচার আর নাই। অথচ তোমার ঠাকুরদা চাঁদনী রাতে পর্য্যন্ত রক্তপাত করত না।"

চিতা চটে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে বল্লে—"রেখে দাও তোমার ও সব শাস্তর। শাস্তর মানবার জন্যে উপোস করে মরতে হবে নাকি! ঠাকুরদা শাস্তর মানবে না কেন! তাদের ত আর আমার মত সাত সন্ধ্যে নিরম্বু উপোস করতে হ'ত না, ক্ষিদেয় পেট পিট একও হয়ে যেত না। তখন থাবা বাড়ালে কিছু না হোক একটা খরগোস ত মিল্‌ত।"

হুতুম চোখ বুজেই বল্লে—"এত অধর্ম্ম ছিল না বলেই মিল্‌ত।"

চিতা চটে কাঁই হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। চুকলি খাবার পর গেছো-প্যাঁচার এই ভণ্ডামি অসহ্য। কিন্তু ডালটা নেহাৎ উঁচু আর পলকা বলেই তাকে এবার একটা হাই তুলে সরে পড়তে হল। যাবার সময় শুধু একবার বলে গেল—"দিনের চোখ গেছে, রাতের চোখও যাক্ তোর।"

হুতুম কিছুই গায়ে না মেখে শুধু বল্লে—"হুম্"।

খানিক বাদে আবার সাবধানে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হনু এসে হাজির। মৌতাতে গেছো প্যাচার চোখ তখন আবার বুজে আসছে।

হনু বল্লে—"দেখলে দাদা চিতার নেমকহারামিটা। তুমি না থাকলেত সাবড়েই দিয়েছিল।

হুতুম বাজে কথা বেশী কয় না, বল্লে—"হুম্"।

হনুর একটু বেশী কিচির-মিচির করা স্বভাব। সে বলেই চল্ল—"অথচ এই আর অমাবস্যায় ওর কি উপকারটা না করেছি? বারশিঙার জলায় মাছের লোভে গেছলেন। এদিকে বুড়ো ময়াল যে কাচ্চা-বাচ্চা সমেত ওইখানেই আড্ডা গেড়েছে সে খবর ত' রাখেন না। জামগাছ থেকে সাবধান না করলে সেই রাতেই হয়ে গেছল আর কি!

হুতুমের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে হনু আবার বল্লে—"আমিই প্রাণ বাঁচালাম আর আমাকেই কিনা তাগ্!"

হুতুম এবার চোখ খুলে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বল্লে—"এ ত আর নতুন দেখছিস্ না বাপু! ও জাতের ধারাই ত এই। থাবায় যারা নোখ লুকোয় তাদের আবার বিশ্বাস করে নাকি? হুম!"

হনু পিঠ্ চুলকে বল্লে—"কিন্তু কি করা যায় বল ত' দাদা! বনে ত'

আর টিকতে দিলে না। এক দণ্ড স্বস্তি যদি থাকে! একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর! গাছে চিতা, নীচে কেঁদো; দাঁড়াই কোথায়?”

হুতুম বল্লে—“হুম্”। হনু হতাশভাবে বল্লে—“একটী উপায় বাৎলাতে পার না হুতুম দা! তোমার এমন মাথা!”

মাথার প্রশংসায় একটু খুসী হয়ে হুতুম বল্লে—“উপায় আছে, কিন্তু পারবি কি?”

“পারব না! খুব পারব। শুধু একা আমার নয় ত, বনের সবাই অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ত' কাল কেঁদো বাগে পেয়ে কাকিনীর দফা রফা করেছে। বয়ার ত রেগে আগুন হয়ে গেছে; ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো মোষের পাল নিয়ে। একবার সুবিধে পেলে হয়।”

হুতুম তাচ্ছিল্যভাবে বল্লে—“ও সব চারপেয়ের কর্ম্ম নয়।”

হনু হুতুমের এই দুর্ব্বলতাটুকু জানে। হুতুম আর সব দিকে খুব বিজ্ঞ খুব ধীর; কিন্তু মানুষের মত দু'পায়ে হাঁটে বলে সেও যে মানুষের জ্ঞাতি তার এই ধারণার বিরুদ্ধে কিছু বল্লে আর রক্ষা নেই।

হনু নরম হয়ে তোষামোদ করে বল্লে—“দু-পেয়ে বলেই না তোমার কাছে আসি পরামর্শের জন্য।”

হুতুম খুসী হয়ে বল্লে—“তবে শোন্।” কিন্তু কথা আর কিছু হল না। দূরের মাদার গাছের ডালের ওপর বুঝি একটা কেন্নোর মত পোকা একটুখানি উঁকি মেরেছিল। শোঁ করে একটা শব্দ হল; তারপরেই দেখা গেল হুতুম উড়ে গেছে সেখানে।

হনু খানিক অপেক্ষা করল, কিন্তু হুতুমের আর দেখা নেই। পোকার খোঁজে সে তখন ডাল ঠোকরাতে ব্যস্ত। আর তার আশা নেই বুঝে হনু খানিক বাদে সরে পড়ল। হুতুমের মর্‌জির খবর সে রাখে।

'তরঙ্গিয়ার' জঙ্গলে সত্যিই বড় গোলমাল। অবশ্য জঙ্গলে আর শান্তি কবে মেলে? জঙ্গলের বাসিন্দারাও সে কথা জানে না এমন নয়, তবু এত উপদ্রব তারা কখনও ভোগ করেনি। বনের ঘুপসি অন্ধকারে বসে শলা-পরামর্শ, শোনা যায় হা-হুতাস, কিন্তু সব চুপি চুপি। কোথায় কেঁদো আছে ওৎ পেতে কে জানে! কে জানে কোন ডালে চিতা আছে ঘুপটি মেরে।

এ বছর ভয়ানক খরা। বারশিঙার জলা ছাড়া সবজায়গার জল গেছে শুকিয়ে, কিন্তু, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও সেখানে যাবার উপায় নেই। বাচ্চা-কাচ্চা সমেত বুড়ো ময়াল সেখানে আড্ডা গেড়েছে। তাদের যদি বা এড়ান যায় কেঁদোর হাতে নিস্তার নেই। কেঁদো একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে সেখানে। এর আগে এমন কখন হয়নি। কেঁদো তখন বনে এসেছে, দু-দশটা মেরেছে আবার চলে গেছে অন্য বনে। এবার তারও যেন আর নড়বার নাম নেই। কিন্তু জল বিহনে আর কদিন থাকা যায়! তেষ্টায় পাগল হয়েই বুনো মোষের মা কাকিনী গেছল মরিয়া হয়ে বারশিঙার জলায়। সেখানে পেছন থেকে পড়ল এসে ঘাড়ে কেঁদো। কাকিনী পিছল জমিতে পাশ ফিরতে না ফিরতেই গর্দ্দান গেল ভেঙ্গে।

সেই দেখে বনের আর কেউ ঘেঁষতে চায় না সেদিকে। 'তুন' পাহাড়ে চিকারার দল ছট্‌ফট্‌ করছে, জলে নামতে সাহস হয় না। কলজে ফেটেই কটা মরল। 'ঝাঁকাল' হরিণের নতুন লোমের জেল্লুষ নেই—সেই ফ্যাকাশে হলদেই দেখায়। মেটে কাল গাউজের দল ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। কালোয়ার গাউজকে দেখলে সত্যিই কান্না পায়। এই খরার দিনে জলে 'গারি' নিতে না পেয়ে তার যা দুর্দ্দশা!

কালোয়ার গাউজের বউ ঢুলানির সঙ্গে সেদিন হনুর দেখা। হাড্ডিসার চেহারা হয়েছে; গায়ের লোম গেছে উঠে।

বুনো নোনাগাছে হনু ছিল বসে। ঢুলানি নীচে দিয়ে যেতে যেতে ওপরে খস্‌খসে আওয়াজ শুনে চমকে কাণ খাড়া করে দাঁড়াল। হনু তাড়াতাড়ি অভয় দিয়ে বল্লে—"না গো না, চিতা নয় আমি হনু!"

হতাশ ভাবে ঢুলানি বল্লে—"আর চিতা হলেই বা কি! এখন চিতায় থাবা মারলেই হাড় জুড়োয়। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

দরদ জানিয়ে হনু বল্লে—"অমন কথা বলতে আছে! এমন দিন কি আর থাকবে?"

ঢুলানি এ কথায় সান্ত্বনা পায় না। বল্লে—"থাকবে বলেই ত মনে হচ্ছে। কেঁদো আর চিতার কি মরণ আছে?"

হনু গম্ভীর হয়ে বল্লে—"আছে বই কি কিন্তু উপায় করতে হবে!"

ঢুলানি একটু উৎসাহিত হয়ে বল্লে—"উপায় কিছু ঠাউরেছ নাকি?"

"সেদিন গেছ্‌লাম ত ভাই হুড়মের কাছে। কিন্তু জান ত ওদের চাল? গায়েই সহজে মাখতে চায় না।"

ঢুলানি ওপর দিকে চেয়েছিল এতক্ষণ, এবার বল্লে—"দুটো পাকা নোনা ফেলে দাও ভাই, জিভটা একটু ভিজুক, জলের তার ত ভুলেই গেছি।"

হনু ক'টা পাকা দেখে নোনা ফেলে দিয়ে বল্লে—"আচ্ছা, ঝোপে ঝাড়ে ঘোর চন্দ্রচূড়ের দেখা পাও না, না হয় কালকেউটের? ওদের বলে দেখলে বোধ হয় কাজ হয়; এক ছোবলেই কাবার।"

নোনা চিবোতে চিবোতে ঢুলানি বল্লে—"পাগল! ওরা কারুর উপকার করবে! বলতে গেলে আমাদেরই দেবে ছুবলে। সেই যে কথায় আছে—

পা নেই, বুকে হাঁটে
ডিমের ছা মাকে কাটে।

—ওরা ত আর মার দুধ খায় না।"

হনু মাথা নেড়ে বল্লে—"তা বটে। তা না হলে ওই বারশিঙার জলার বুড়ো ময়াল একদিন কেঁদোর গায়ে পাক দিতে পারে না? তাত দেবে না—তার বদলে হাড়-পাঁজরা ভাঙবে যত চিতল আর খাউট্টা হরিণের। নাঃ হুতুমের কাছে একবার যেতেই হয় পরামর্শ করতে। বুড়োটার যে দেখাই পাওয়া যায় না।" ঢুলানি গাছের গায়ে দু'বার শিঙ ঘসে চলে যেতে যেতে বল্লে—"কি হয় না হয় খবরটা দিও।"

হনু এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে বসে বল্লে—"সন্ধ্যাবেলা? 'থলায়' গেলেই পাব ত?"

ঢুলানী বিষণ্ণভাবে বল্লে —"থলায় কি আর কেউ যায়? সে আমোদের দিন গেছে। খবর দিও 'দুন' পাহাড়ের তলায়....

ঢুলানি আরও কিছু হয়ত বলত; কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল কাছেই কেঁদোর কাসি। ঢুলানি মাথা তুলে পিঠে শিঙে ঠেকিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দিলে ছুট্। হনু দু'টো ডাল আরো ওপরে বসেছে ততক্ষণে।

ক'দিন বাদে আবার হুতুমের সঙ্গে হনুর দেখা। সবে সকাল হয়েছে আগের রাতে হুতুমের ভোজটা একটু ভাল রকমই হয়েছে মনে হ'ল। দু'চোখ বুজিয়ে গাছের কোটরে হুতুম যেন ধ্যানে বসেছিল।

আগের রাত্রে নতুন শিঙের চামড়া ঘসে তোলবার সময় 'কাল শিঙে' চিতার হাতে মারা গেছে। হনু সেই খবরটা 'দুন' পাহাড়ে চিতারার দলে প্রচার করবার জন্য তাড়াতাড়ি চলেছিল, হঠাৎ গাছের কোটর থেকে 'হুম' শুনে চম্‌কে দাঁড়াল।

তারপর দেখতে পেয়ে বল্লে—"এই যে দাদা! ক'দিন ধরে তোমাকে বাদাম খোঁজা করেছি।"

হুতুমের মেজাজটা আজ ভাল বল্লে—"কেন হে?"

"কেন, আবার বলতে হবে? তোমার মত বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান দু'পেয়ে থাকতে এ বনে আমরা সবাই কি মারা পড়ব বলতে চাও। দোহাই হুতুমদা, একটা উপায় বাৎলাও।"

হুতুম বল্লে "হুম, বলবখ'ন।"

হনু অস্থির হয়ে উঠেছিল। বল্লে "না, বলবখ'ন নয়, এখনই। তোমার দেখা ত' আর তপিস্থে করলেও মেলে না এখন যখন পেয়েছি আর ছাড়ছি নে।"

হুতুম বল্লে, "হুম বলছি, উপায় ত' বলতে পারি, কিন্তু লাভ কি?"

"কি যে বল হুতুমদা লাভ কি? এই নখ-চোরা দুটো মরলে আর আমাদের ভাবনা কি?

হুতুম গম্ভীরভাবে বল্লে, "আর ভাবনা থাকবে না ত?"

"নিশ্চয়ই না।"

হুতুম বল্লে "হুম, তবে শোন। বারশিঙার জলা পেরিয়ে কসাড় বন ছাড়িয়ে যে দু'পেয়েদের গাঁ চিনিস?"

হনু বল্লে, "খুব চিনি, আমার ভাই খাটো ল্যাজকে সেখানেই ত' ধরে রেখেছে।"

হুতুম বল্লে, হুম! সে গাঁ থেকে দু-পেয়ে আনতে হবে।"

হনু একটু হতাশ হয়ে বল্লে, "বাঃ, তারা আসবে কেন?"

হুতুম বল্লে, "হুম, আসবে রে, আসবে। 'তুন' পাহাড়ের রাঙা নুড়ি দেখেছিস্ ভোরবেলার সূর্য্যির মত লাল। সেই নুড়ির টানে আসবে।"

হনু শুনে ত অবাক। বল্লে, "সে নুড়ি ত' চোখে দেখেছি, না বাবা

দাতে ভাঙ্গা, না আসে কোন রস। সেই নুড়ি নিয়ে কি হবে দু'পেয়ের?

হুতুম একটু চটে উঠে বল্লে—"তুই দু'পেয়ের হালচাল কি জানিস্?"

হনু অগত্যা চুপ করল। হুতুম আবার বল্লে, "কসাড় বনের ধারে গারো-বাদার পাশে দু'পেয়েরা আসে বেত কাটতে; তাদের সেই নুড়ি দেখাতে হবে।"

"কেমন করে দেখাব?"

"কেমন করে আবার দেখাবি। বেতবনে নুড়ি ছড়িয়ে রেখে দিগে যা; এদিকে ওদিকে আর কিছু ছড়াস্। দু'পেয়ের চোখ সব দেখতে পায়।"

হনু অবাক হয়ে বল্লে "তা না হয় দেখল, কিন্তু আমাদের তাতে কি হবে? কোঁদো আর চিতাকে সামলাবে কে?"

হুতুম গম্ভীর হয়ে বল্লে "সে ভাবনা তোর কেন? যা বল্লাম কর আগে, তারপর বসে বসে দেখ কি হয়। অতই যদি বুঝবি তা হলে গায়ে পালক গজাবে যে।"

হাজার হলেও হুতুম জ্ঞানীগুণী লোক। এতটা নীরবে হজম করে হনু বল্লে, "তবে কুড়াইগে নুড়ি, কেমন? ঠিক বলছ ত' হুতুমদা, এতেই হবে?"

হুতুম শুধু বলেন—"হুম।"

* * * *

তারপর ক'বছর কেটে গেছে। 'হরগিয়ার জঙ্গলের আর সে চেহারা নেই। জঙ্গল অনেক সাফ হয়ে গেছে। কত গাছ যে কাটা পড়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। 'তুন' পাহাড়ের ওপরে আর নীচে কাঠের আর পাথরের বাসা। দু'পেয়েরা রাতে সেখানে ঘুমোয় আর দিনে পাহাড় কেটে খান্ খান্ করে। পাহাড়টাই বুঝি তারা ফেলবে খুঁড়ে

হনুর আজকাল ভারী বিপদ। বন্ধুবান্ধব কেউ আর বড় তরঙ্গিয়ায় নেই। তবু বন ছাড়তেও তার মন কেমন করে। তাই কোন রকমে সে পড়ে আছে।

সেদিন হঠাৎ বাদাম গাছে হুতুমের সঙ্গে দেখা। গাছপালা গেছে কমে ; দিনের বেলা বনে আজকাল তেমন অন্ধকার হয় না। হুতুম তাই চোখে বড় কম দেখে। হনু 'দাদা' বলে ডাক দিতে প্রথমটা ত' চিনতেই পারল না।

তারপর মিটমিট করে খানিক ঠাউরে বল্লে—"কে হনু নাকি ? আছিস কেমন ?"

হনু ম্লান ভাবে বল্লে, "আছি আর কেমন দাদা "

হুতুম আবার চোখ বুজবার উপক্রম করছিল. হনু বল্লে—"তরঙ্গিয়ার জঙ্গলের কি হাল হয়েছে দেখেছ ত' দাদা '"

হুতুম একটু অবাক হয়ে বল্লে, "কেন, কেঁদো আর চিতা ; অনেকদিন মারা পড়েছে ! সেই খরার বছরেই না ?"

"তা ত পড়েছে. কিন্তু সেই সঙ্গে আমারও যে লোপাঠ হয়ে গেলুম। সারা দিন ঘুমোও খোঁজ ত' আর কিছুর রাখ না ? 'তুন' পাহাড়ের চিতারার বংশে বাতি দেবার যে কেউ নেই। দু'পেয়ের যে বাজ-লাঠিতে কেঁদো গেছে তাতেই চিতারার দফা-রফা। গাউজ'দের যে কটা বাকী ছিল কোন বনে যে গেছে কোন পাত্তা নেই। ঝাকাল দু'একটা আছে এখনও. কিন্তু আর বেশী দিন নয় ; বাজ-লাঠিতে গেল বলে। বুড়ো ময়াল পর্যন্ত তল্লাট ছেড়ে গেছে। দিনরাত গুড়ুম গুড়ুম. দিনরাত খটাখট। এ গাছ পড়ছে, ও গাছ পড়ছে। দু'দণ্ড ত' আর স্বস্তি নেই।"

হুতুম বল্লে—"হুম।"

"তোমার কথায় ঝুড়ি ছড়িয়ে প্রথমটা ত' ভালই হল। আজ দু'জন

কাল চারজন, দু'পেয়েরা ক্রমে ক্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল তরঙ্গিয়ায়। তারা কেঁদোকে মারল বাজ-লাঠিতে চিতাকে ধরল ফাঁদে। আমরা ত' একেবারে স্বর্গ পেলাম হাতে। ওমা তারপর আমাদেরই পালা কে জানত? তুন পাহাড়ে তাবা যেদিন বাসা বাঁধল তার পর থেকেই আমাদের হল সর্ব্বনাশ! কেঁদো আর চিতা তবু একটা-দুটোর বেশী মারত না, এদের হাতে দলকে দল সাবাড়।"

হুতুম গম্ভীর মুখে বল্লে—"হুম্।"

"ভালো করতে গিয়ে এ কি হল বলত?" হনু কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে—"তরঙ্গিয়ার এ দশা ত চোখে দেখা যায় না।"

হুতুম চোখ বুঁজে প্রশান্তভাবে বল্লে, "যা হবার ঠিক তাই হয়েছে; চোখ বুঁজে থাকতে শেখ, কিছু দেখতে হবে না!"

এক অমানুষিক আত্মহত্যা

খবরের কাগজ যাহারা নিয়মিতভাবে পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে ১৩৪৫ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখের নববাণী পত্রিকার সাতের পাতার তৃতীয় কলমের ৩০ লাইন পরে একটি বিস্ময়কর সংবাদ বাহির হইয়াছিল। স্মরণশক্তি যাহাদের সবল নয় তাঁহাদের জন্য উক্ত সংবাদটি এখানে যথাযথ ভাবে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গৌহাটি নগরে বিষম চাঞ্চল্য

রাজপথে বাঘের আবির্ভাব

"গতকল্য সন্ধ্যার পর কেমন করিয়া একটি বৃহদাকার বাঘ নগরের ভিতর প্রবেশ লাভ করে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত শহরের নানাস্থানে বহু ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ভীত হয়। বাঘটি শহরের ভিতর হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে উদভ্রান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। সকাল বেলা জনৈক শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় উক্ত ভদ্রলোকের বন্দুকের গুলিতে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। সুখের বিষয় নগরের কোন ব্যক্তির তাহার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় নাই।"
২রা ভাদ্র, গৌহাটি।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা একবাক্যে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে নিশ্চয় কোন ঘটনাই অকারণ বা নিরর্থক নয়। সুতরাং গৌহাটি সহরে এই ব্যাঘ্রপ্রবরের আবির্ভাবেরও কোন না কোন দিক দিয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল।

সে প্রয়োজন যে কি তাহা বুঝিবার পূর্বে কিন্তু আমাদের অঙ্গুলালের জীবন-বৃত্তান্ত কিছু জানা আবশ্যক।

আত্মনাথ নিঃশঙ্ক শঙ্করী অপেক্ষা বয়সে বছর আটেকের ছোট হইলেও

কল্পনায় চিন্তায় তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষের মোটরকারের মডেল অপেক্ষাও সে ঝকঝকে, তকতকে, আধুনিক; কলিকাতা নগরীতে এমন কোন সভা-সমিতি বা সম্মিলনী হয় না যেখানে আত্মনাথকে তাহার রূপাবাঁধানো ছড়ি, গগল্‌স চশমা ও মাদ্রাজী চাদর সমেত দেখা না যায়। তাহার কবিতা বাংলার প্রায় সমস্ত মাসিকেরই পাদপূরণ করিয়া থাকে এবং এদেশের যে কোন সল্লায়ু পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায় আত্মনাথের রচিত গল্প তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পূর্ব্বে আত্মনাথ কখনও ইলেকট্রিক লাইট দেখে নাই এবং তাহাদের পদ্মাতীরস্থ গ্রামের মৈমুমাঝির 'গহনা'র নৌকা ছাড়া কোন বাহন ব্যবহার করে নাই। সেই জন্যই কলেজে পড়িবার জন্য প্রথম কলিকাতায় আসিয়া আত্মনাথ সহরের ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। এবং দুই বৎসরের মধ্যে আত্মনাথকে আর চিনিবার উপায় রহিল না। পরিবর্তন যে শুধু তাহার বেশভূষায় ও আচরণে ঘটিল তাহা নয়—তাহার মনোজগতেও সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। আত্মনাথের সে উৎকট উৎকর্ষের পরিচয় কিন্তু আমরা দিতে অক্ষম, পাঠকদের অনুমানের উপরই তাহা ছাড়িয়া দিলাম।

কলেজে পড়িতে আসিয়া প্রথম প্রথম আত্মনাথ ছুটিতে দেশে যাইত, কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল কলিকাতাতে তাহার কাজ এত বেশী যে দেশে যাইবার তাহার অবসর নাই। অন্ততঃ মা চিঠির পর চিঠিতে তাহাকে আসিতে লিখিয়া ওই কথাই জবাব পাইতেন।

আত্মনাথের দেশের প্রতি বিরাগের কারণ ছিল। তাহার পিতা সেকেলে লোক, একালের প্রয়োজনে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিতে দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার রীতিনীতির পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আত্মনাথ যতবড় আধুনিকই হোক না, রাশভারী পিতার মুখের উপর কথা কহিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারে নাই। দেশে গিয়া তাহার নব্য রুচি ও মতামত প্রতিক্ষণেই ক্ষুণ্ণ হইত।

সেখানে সকালে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজার আগে আহারনিষেধ। সেখানে রাতদিন জামা গায় দিয়া থাকা অনাবশ্যক বিলাস, সেখানে পানীয় হিসাবে চায়ের কোন মূল্য নাই এবং সেখানে জুতার স্থান একমাত্র বাহিরের ঘরে। শুধু তাই নয় সেখানে নিত্য-নিয়মিত ভাবে গৃহের পুরোহিতকে প্রতিদিন প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইতে হয়।

আজকালকার দিনে কোন সংসারের এমন নিষ্ঠার কথা শুনিলে যদি বাড়াবাড়ি মনে হয় তাহা হইলে আমরা নাচার। আত্মনাথের পিতৃভাগ্য এমনি।

দেশে থাকিতে আত্মনাথ এ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারে না। সেজন্য এ সমস্ত এড়াইবার সহজ উপায় স্বরূপ সে দেশে যাওয়াই বন্ধ করিয়াছে।

আত্মনাথ কয়েক বৎসর এমনি করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া আধুনিকতা যতখানি আয়ত্ত করিল, বিদ্যাটা তেমন করিয়া পারিল না। বি-এ পরীক্ষায় বার দুই ফেল করিয়া আরো পৃথিবীর অনেক বড় বড় মস্তিষ্কের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রদত্ত মাসহারার আশা ও কলিকাতায় থাকাও ছাড়িতে হয়, এ কথা আত্মনাথ জানিত। উপায়ও সে একটা করিল। ইতিপূর্ব্বে খ্যাত অখ্যাত নানা মাসিকে ও সাপ্তাহিকে বাংলা সাহিত্যকে কয়েক যুগ আগাইয়া

দিবার সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে — তাহারই জোরে একটি বাংলা কাগজে তাহার কাজ জুটিয়া গেল। এবং সংবাদটা আত্মনাথের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কোন রকমে দেশে পৌঁছিল।

পুত্রের চাকরীর সংবাদে খুশী হওয়া দূরে থাক্ পিতা পত্রে লিখিলেন, “তোমার লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়ার সংবাদে দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক এই পত্র পাওয়া মাত্র দেশে চলিয়া আসিবে। তোমার চাকরীর কোন প্রয়োজন নাই। এখনও রায় পরিবারের যাহা আছে তাহাতে তাহাদের বংশের কাহাকেও চাকরী করিতে হইবে না। মাতা সে চিঠির সঙ্গে একটি ছোট কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন,” তোমার বিবাহের সমন্ধ ঠিক করিয়াছি। কলিকাতায় আর তোমার থাকিবার দরকার নাই।

বলা বাহুল্য আত্মনাথ কোনপত্র পাইয়াই খুশী হইতে পারিল না। চাকরী করার প্রয়োজন না থাকিলেও কলিকাতায় বাস তাহার না করিলেই নয়। দেশে স্বাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যাহাই থাক্ তাহার মনের উৎকর্ষের উপযোগী চিন্তা ও সৃষ্টির আবহাওয়া নাই। সেখানে সে কোন মতেই আর বাস করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জীবনের সঙ্গিনীরূপে যে মানসীকে সে এতদিন ধরিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, মাতার পছন্দ করা পাড়াগেঁয়ে মল ও নোলক পরা মেয়ের সহিত তাহার কোন দিক হইতে মিল হইবে না, সে জানে। আত্মনাথ নানা রকম ওজর আপত্তি তুলিয়া দেশে যাওয়া ও আসন্ন বিবাহ উভয় বিপদই কোনরকমে ঠেকাইয়া রাখিল। কিন্তু বেশীদিন এমন করা চলিল না।

মাতার সাঙ্ঘাতিক অসুখের তার পাইয়া আত্মনাথ দেশে গিয়া দেখিল বিবাহের আয়োজন চলিতেছে

এই প্রবঞ্চনার আত্মনাথ চটিল, কিন্তু পিতার সামনাসামনি প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। বিবাহ তাহার হইয়া গেল।

এমনই হোক বিবাহের রাত্রের বোধ হয় একটা নেশা আছে। নিজের অনিচ্ছাসত্বে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেও আত্মনাথের আগা-গোড়া ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগিতেছিল বলা যায় না। শুভ-দৃষ্টির সময় মেয়েটিকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়াও চেহারার খুঁত সে বিশেষ বাহির করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত হয়ত সব ভালোই হইত কিন্তু বাসরঘরে শ্যালিকা সম্পর্কীয়া গ্রাম্য মেয়েরা তাহার মেজাজ একেবারে চটাইয়া দিল। বাংলার আধুনিক চিন্তা ও শিল্প জগতের একজন উদীয়মান দিকপালের কোন সম্মান তাহারা রাখিল না। নানাপ্রকার অসভ্য অভদ্র ইতরজনোচিত রসিকতা করিয়া তাহাকে একেবারে নাকাল করিয়া তুলিল। ইহার উপর আবার তাহার নববিবাহিতা বধূ নীলিমা একসঙ্গে তাহার লাঞ্ছনায় ঘোমটার তলাতেও হাসি চাপিতে না পারিয়া তাহার মন একেবারে বিষ করিয়া দিল।

নীলিমার ভাগ্য মন্দ। ফুলশয্যার রাতে স্বামী তাহার সহিত কথাই কহিল না এবং তাহার পরদিন যখন সে শুনিল যে আত্মনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গিয়াছে তখন তাহার লজ্জা ও দুঃখের অবধি রহিল না।

ইহার পর আর বহুদিন আত্মনাথ ও নীলিমার দেখা হয় নাই। আত্মনাথের পিতা অত্যন্ত তেজস্বী লোক। পুত্রের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া তিনি তাহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়াছেন। আত্মনাথ আর দেশেও যায় না। যাইবার তাহার বিশেষ ইচ্ছাও নাই। আত্মনাথ কলিকাতায় না থাকিলে বাংলার সাহিত্য যে কানা হইয়া যায়।

নীলিমার পিতা জামাইকে দেশে আনিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আত্মনাথের মন গলে নাই। যে সব অসভ্য অশিক্ষিত মেয়েদের হাতে সে অমন অভদ্রভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে তাহাদেরই অনুরূপ একটি নোলক-পরা গ্রাম্য মেয়েদের প্রতি তাহার মনে কোন করুণা নাই।

ইতিমধ্যে আত্মনাথ ও নীলিমার মধ্যে মাত্র দুইটি চিঠি লেখালিখি হইয়াছিল।

স্বামীর অবহেলায় অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়া লজ্জায় মাথা খাইয়া সখীদের অনুরোধে নীলিমা একবার একটি চিঠি লিখিয়াছিল।

আত্মনাথ তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিল তাহা আমরা প্রকাশ করিয়া দিলাম।

আত্মনাথ লিখিয়াছিল, 'তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি আমার পত্রের উপর 'শ্রীচরণেষু' কেন লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমার ক্রীতদাসী নয় যে আমার চরণবন্দনা করাই তোমার কাজ। তা' ছাড়া আমার শুধু চরণেই তুমি যদি শ্রী দেখিয়া থাক তাহা হইলে আমার পক্ষে সেটা গৌরবের কথা নয়। 'শ্রীচরণেষু' বানান করিতেও তুমি ভুল করিয়াছ। তোমার পত্রে বানান ভুল ওই একটি নয় আরও যথেষ্ট আছে ভালো করিয়া লেখা পড়া না শিখিয়া চিঠি লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমাকে প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিতে তোমার কোন্ সখী শিখাইয়াছে জানিনা' কিন্তু এইটুকু বুঝিতে পারি যে কোন সভ্য মেয়ের সহিত তোমাদের পরিচয় হয় নাই। ফুল-আঁকা লাল চিঠির কাগজ ব্যবহার করিতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।"

ইহার পর আর তাহারা কেহ কাহাকেও চিঠি লেখে নাই। এমন করিয়া কতদিন যাইত বলা যায় না, কিন্তু ইহার ভিতর গৌহাটিতে বড

গোষ্ঠের একটা সম্মিলনী বসিল এবং আত্মনাথকে তাহার কাগজের তরফ হইতে বিশেষ সংবাদদাতারূপে সেখানে যাইতে হইল।

সম্মিলনী শেষ হইযাছে। আত্মনাথ কলিকাতায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় আশ্চর্য্যভাবে তাহার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। শ্বশুর মহাশয় আকাশের চাঁদ হঠাৎ ধুলির ধরণীতে নামিয়া আসিযাছে এমনি ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি এখানে? কটার ট্রেনে এলে? আজ বড্ড জরুরি কাজে একটু সকালে বেরুতে হয়েছিল, নইলে দেখা হয়ে যেত।"

সে তাঁহাদেরই বাড়ীতেই আসিয়াছে এমন ভুল করার ধৃষ্টতার জন্য শ্বশুরের উপর চটিয়া আত্মনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "আমি আজ আসিনি, আমি যাচ্ছি, এখানকার সম্মিলনীতে এসেছিলাম গত রবিবার।

পলকের মধ্যে শ্বশুরের মুখে গভীর পরিবর্ত্তন দেখা গেল। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন, "এখানে এতদিন এসেছ, আর আমাদের সঙ্গে দেখা করনি?"

আত্মনাথ এবার সত্য কথাই বলিল, "আপনারা এখানে এসেছেন তা কেমন করে জানব?"

"বাঃ, আমি যে এখানে বদলী হয়েছি আজ তিনমাস তা জানতে না?" না জানিবারই কথা। গত কয়েকমাস শ্বশুরবাড়ীর চিঠির প্রতি বিশেষ মনোযোগ সে দেয় নাই আত্মনাথ চুপ করিয়া রহিল।

শ্বশুরমহাশয় বলিলেন, "বেশ, এখন ত জানলে, আজ আর না দেখা করে যেতে পারবে না।"

একা থাকিলে রূঢ়ভাবে হোক বা যে কোন রকম ওজর আপত্তি তুলিযা হোক আত্মনাথ এ নিমন্ত্রণ এড়াইয়া আসিতে পারিত। কিন্তু সঙ্গে কলিকাতার জন দুই বন্ধু ছিল। ইহাদের কাছে তাহার বিবাহের সংবাদ

গোপন করিয়া রাখার দরুণ অমনিই সে এখন বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্বশুর মহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি প্রয়োজন হইলে শেষ অস্ত্র হিসাবে ইহাদের কাছে জামাইয়ের বনিদারুণ ঔদাসিন্য সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেও পশ্চাদপদ হইবেন না। আত্মনাথ 'না' বলিতে পারিল না কিন্তু রাস্তার মাঝে হঠাৎ এমনভাবে আবির্ভূত হইয়া তাহার সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত করিবার জন্য শ্বশুর এবং তাহার সমস্ত পরিবার বর্গের উপর বিষম বিরিষ্ট হইয়া উঠিল।"

এতদিন বাদে জামাতার আগমনে তাহার আদর-আপ্যায়নের যেরূপ ঘটা হইল তাহাতে আর কিছু না হোক আত্মনাথের অহঙ্কার তৃপ্ত হইবার কথা। সাহিত্য জগতে তাহার মর্য্যাদা যে কত তাহার একটা হিসাব আত্মনাথ মনে মনে করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেমূল্য এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাকে কেহ দেয় নাই। এই একটি বাড়ীতে পৃথিবীর এত লোকের মাঝে তাহার জন্যই এতখানি সম্মান যে জমা হইয়া আছে তাহা জানিতে পারিয়া আত্মনাথ হয়ত সম্পূর্ণভাবে খুশীই হইত, কিন্তু সে খুসীর মাঝে একটি খুঁত রহিয়া গেল।

বাসরঘরে তাহাকে যাহারা অশেষপ্রকার লাঞ্ছিত করিয়াছিল তাহাদের অধিনায়িকাকে এ বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মন দমিয়া গেল। জানা গেল মলিনা সম্পর্কে তাহার স্ত্রীর মামাতো বোন, কয়েকদিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।

মলিনা প্রথমটা নিরীহ ভালমানুষটির মত যেভাবে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল তাহাতে আত্মনাথের আশঙ্কা অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই নিজের ভুল সে বুঝিতে পারিল।

শ্বশুরের বিস্তর অনুরোধ অনুযোগ সত্ত্বেও জরুরি কাজের অজুহাত দেখাইয়া আত্মনাথ, সন্ধ্যার পরই তাহাকে কলিকাতায় যাইবার জন্য

ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়াছিল। জামাতা যদি বা অনেক কষ্টে একবার আসিয়াছে তাহাকে বেশী থাকিবার জন্য পেড়াপীড়ি করিয়া চটাইতে শ্বশুর মহাশয়ের সাহস হয় নাই। আত্মনাথ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। এমন সময় শাশুড়ি ঠাকরুণ প্রসন্নমুখে আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে এলাম বাবা, তোমাদের বাড়ীতে যে নিয়মের কড়াকড়ি, রাত্রে তুমি মাংস খাবে ত?

আত্মনাথ অবাক হইয়া বলিল, "মাংস রাত্রে ত আমি খাব না, আমায় খানিকবাদেই কলকাতা যেতে হবে যে!"

মলিনা সঙ্গেই আসিয়াছিল। শাশুড়ি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "বাঃ, এই যে মলিনা বললে—তুমি থাকতে রাজী হয়েছ"

আত্মনাথকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মলিনা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আহা, এখন আবার লজ্জা দেখানো হচ্ছে? অত গোঁয়ামী কেন বাপু, এইমাত্র আমায় কি বললে?"

লজ্জায় রাগে আত্মনাথের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। মলিনা আবার বলিল, "তুমি যাও না মা, দিদিমা। দু'বছর পরে ঢাকা দিয়েছেন তাই এখন লজ্জা হয়েছে বুঝতে পারছ না।"

শাশুড়ি ঠাকরুণ চলিয়া গেলেন। আত্মনাথ গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ফুলশয্যার রাত্রের পর স্বামী স্ত্রীর এই প্রথম দেখা।

আত্মনাথ ঘরে ঢুকিতেই নীলিমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিটি ভারী মিষ্ট। কিন্তু আত্মনাথের মন তখন মলিনার শঠতায় তিক্ত হইয়া আছে। নহিলে সে শুধু হাসি নয় অনেক কিছুই দেখিতে পাইত। দুই বৎসরে নীলিমার শ্রী অনেক ফিরিয়াছে। তাহার বেশভূষায় যে গ্রাম্যতা সম্বন্ধে আত্মনাথের বিরূপতা, তাহারও আর কোন চিহ্ন নাই। ফিকে নীল একটি ব্লাউসের উপর চাওড়া কস্তাপাড় শাড়ীটিতে তাহাকে

চমৎকার মানাইয়াছে। আত্মনাথ কোন দিকেই নজর না দিয়া গম্ভীর হইয়া খাটের একধারে গিয়া বসিল। কিন্তু স্বামীর ঔদাসিন্যে অভিমান করিবার অবসর আর নীলিমার নাই। এই দুই বৎসরে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে। নিজেই অগ্রসর হইয়া সলজ্জভাবে স্বামীর একটা হাত ধরিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি আমার উপর রাগ করেছ ?

আত্মনাথ হাতটা ছাড়াইয়া লইল, উত্তর দিল না। নীলিমার চোখে হয়ত জল আসিল, তবু সে নিরস্ত হইল না। আর একবার স্বামীর হাত ধরিয়া সে বলিল, "আমার কি দোষ বল ?

আত্মনাথ তিক্তকণ্ঠে বলিল, "তোমরা সব সমান ওই মলিনার ত তুমি বোন। আর এরকম জুয়াচুরি করে আমায় একদিন ধরে রেখে খুব লাভ হবে মনে করছ।"

কথাটা বড় রূঢ়। তবু নীলিমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দিদির কি দোষ বল, আমা-দের জন্যেই ত করেছে। তোমার নিজের কি একদিন থাকার ইচ্ছে হয় না।"

আত্মনাথ গম্ভীর হইয়া বলিল, "না।"

নীলিমা এবার অত্যন্ত আহত হইল। আজ সে অনেক আশা করিয়া স্বামীর দেখা পাইবার জন্য বসিয়াছিল। শোবার ঘরের কুলঙ্গিতে তাহার বই খাতা সাজানো এই দুই বৎসর স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে কি ভাবে পড়াশুনা করিয়াছে, কতখানি নির্ভুল ও নিখুঁত ভাবে লিখিতে শিখি-য়াছে, তাহার বড় আশা ছিল সমস্তই সে স্বামীকে দেখাইবে। এই রূঢ় আঘাতে সমস্ত আশা চুরমার হইয়া তাহার একটু রাগই হইল। বলিল, "তাহলে তুমি না থাকলেই ত পারতে।"

স্বরে ঈষৎ কাঠিন্যের পরিচয় পাইয়া আত্মনাথ একটু অবাক হইয়া বলিল "তাই নাকি।"

নীলিমা আরও কঠিন স্বরে বলিল, "নিশ্চয়, তোমাকে ত কেউ জোর করে ধরে রাখেনি।"

আশুনাথ বিছানা হইতে উঠিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল,,, বটে ! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি রাখতে চাও।"

নীলিমা বলিয়া ফেলিল' "আমার দায় পড়েছে।"

"আচ্ছা, তাহলে চললাম"—বলিয়া হঠাৎ গট্ গট্ করিয়া দরজার কাছে গিয়া আশুনাথ খিল খুলিয়া ফেলিল ! মুখ দিয়া রাগের মাথায় অমন একটা কথা বাহির হইয়া পড়িবে ও তাহার পরিণতি এমন হইবে নীলিমা ভাবে নাই। সে ভীত হইয়া একবার আশুনাথকে বারণ করিতে গেল। কিন্তু "আর কখনো দেখা হবে না, মনে রেখো" বলিয়া চক্ষের নিমেষে আশুনাথ দরজা খুলিয়া তখনই বাহির হইয়া গেছে।

অন্ধকার রাত। দরজার বাহিরে তারের বেড়ার ঘেরা একটি বাগান অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। বাগানের কাঁকর দেওয়া পথ খানিকটা পার হইয়া লোহার গেট।

আশুনাথ অন্ধকারের ভিতর হাতড়াইয়া গেটের হাতল খুঁজিয়া পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া দেখিল গেট বন্ধ নয়। কিন্তু গেট খুলিতে গিয়া মুস্কিল হইল। অন্ধকারে মনে হইল একটা গরুই বোধ হয় গেটের গায়ে হেলান দিয়া শুইয়া আছে, তাহাকে না উঠাইলে গেট খোলা যায় না।

আশুনাথ গরুটাকে উঠাইবার জন্য বলিল, "হেট্ হেট্।" গরুটা তবু উঠিল না। আশুনাথ অসহিষ্ণু হইয়া গেটটা নাড়িয়া তাহার গায়ে আঘাত করিয়া আবার বলিল, "হেট্ হেট্, ওঠ্ বেটা।"

হঠাৎ গরুটা একটু গা নাড়া দিয়া অদ্ভুত এক আওয়াজ করিল। গরুর গলা হইতে এমন আওয়াজ আশুনাথ কখনও শোনে নাই। একটু

বিস্মিত হইয়া আর একবার গেট নাড়া দিতেই গরুটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মনাথের মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। হাজার অন্ধকার হইলেও গরু কখনও এমন আকৃতি লাভ করিতে পারে না।

যেটুকু সন্দেহ আত্মনাথের মনে ছিল তথাকথিত গরুর আর একটি আওয়াজেই তাহা দূর হইয়া গেল। আর গেট খোলার সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এক ছুটে সে একেবারে বাড়ীর রকে গিয়া হাজির। কিন্তু এখন উপায়? যে জানোয়ারটিকে সে গেটের ধারে দেখিয়া আসিয়াছে তাহাকে কল্পনার ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া উপেক্ষা করিবার সাহস তাহার নাই। সহরের ভিতর গৃহস্থপল্লীর মাঝখানে বিশালকায় ব্যাঘ্রের আবির্ভাব সাধারণ যুক্তিতে যত অসম্ভবই মনে হউক, নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করে কি করিয়া? এ গেটের বাহিরে যাওয়া তাহার পক্ষে আজ অসম্ভব। কিন্তু অমন করিয়া তেজ দেখাইয়া চলিয়া আসিবার পর স্ত্রীর ঘরে সে ফিরিবেই বা কেমন করিয়া? কথাগুলি লিখিতে যত বিলম্ব হইল আত্মনাথের চিন্তা অবশ্য তাহা অপেক্ষা আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরের গেটের কাছে ভূতপূর্ব্ব গোবৎসের নড়িবার শব্দ পাইয়া আত্মনাথ একমুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর গিয়া দরজার খিল লাগাইয়া দিল। তারপর ফিরিয়াই দেখিল, মলিনা তাহার রোরুদ্যমানা স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর কিন্তু আত্মনাথের আর যাহাই হোক উপস্থিত বুদ্ধির অভাব ছিল না।

মলিনা তাহার দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কিগো বীরপুরুষ, স্ত্রীকে ফেলে পালিয়েছিলে কোথায়?"

সদ্য সদ্য যে ঘটনাটি ঘটিয়া গেছে বীরপুরুষ সম্বোধনটা সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই করা হয় নাই, তবু আত্মনাথের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। স্বচক্ষে সে যাহাই দেখিয়া ফিরিয়া আসুক মলিনার কাছে সে কাহিনী বলিলে তাহার লাঞ্ছনার যে অবধি থাকিবেনা, একথা সে অনেক আগেই জানে। না, আত্মসম্মান বজায় থাকে এমন একটা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গত কারণ তাহার বাহির করিতেই হইবে।

মলিনার কথার উত্তরে প্রথমটা সে বোকার মত একটু হাসিল। মলিনা আবর বলিল, "বীরপুরুষ, হাঁপাচ্ছ যে বড়!"

আত্মনাথ বলিল, "তোমরাও ত দেখি ফোঁপাচ্ছ।"

"বাঃ, এই যে মুখে কথা ফুটেছে! কিন্তু ছেলেমানুষকে এই রকম করে ভয় দেখানোতে কি বাহাদুরী আছে বাপু? ও ত কেঁদেই সারা! আমি যত বলি, "কক্ষনো চলে যায়নি দেখ, এক্ষুনি আসবে।'—ওর কান্না কি থামে?"

বলা বাহুল্য অকূলে কূল পাইয়া তাহার চলিয়া যাওয়ার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আত্মনাথ বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না। মনে মনে অদূর ভবিষ্যতে মলিনা মেয়েটি সম্বন্ধে তাহার মতামত যথাসম্ভব সংশোধন করিবে এমন একটা সঙ্কল্পও সে করিয়া বসিল। দরজার খিলটা ভাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা আর একবার দেখিয়া তাহার পর সে প্রসন্ন মনে বিছানার ধারে গিয়া বসিল।

সেই এক রাত্রে স্বামী—স্ত্রীর কি আলাপ হইয়াছিল বলিতে পারিনা, কিন্তু দেখা গেল তাহার পরের দিনও আত্মনাথের কলিকাতায় যাইবাব বিশেষ তাড়া নাই এবং পরের দিনও আত্মনাথকে গৌহাটি ত্যাগ না করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। এবং নীলিমা মাত্র বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়া কি করিয়া আত্মনাথের কল্পনালোকের মানসীকে হার মানাইল তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধির অতীত।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই ক'দিনে তহার নিজের খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িবার উৎসাহও আস্তনাথের হয় নাই।

তাহাদের দাম্পত্যজীবনের বিরোধ ঘুচাইবার জন্য যে মহাপ্রাণ ব্যাঘ্র জঙ্গল ছাড়িয়া লোকালয়ে আসিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, তাহাকে সে নিজের বিকৃত কল্পনাপ্রসূত কল্যাণকর বিভীষিকা বলিয়াই আজো জানে।

ছবি

প্যারিমোহনবাবু আবার মোড়ের পানের দোকানটায় ফিরে চললেন। সকাল থেকে হাঁটাহাঁটি বড় বেশী হয়েছে, কোমরের ব্যথাটাও বেড়েছে। জলকাদার ভেতর এতখানি রাস্তা আবার ফিরে যেতে অত্যন্ত কষ্টই হবে, তবু না গিয়ে তাঁর উপায় নেই। একবার অবশ্য মনে হয়েছিল পয়সা দুটো রাস্তার কোন গরীব ভিখিরীকে দিয়ে দিলেই হ্যাঙ্গাম চুকে যায়। কিন্তু বিবেকের দংশন তাতে শান্ত হয় না। এ দুপয়সা দান করার অধিকার ত তাঁর নেই। দোকানদার পয়সা ফেরৎ দেবার সময় ভালো করে না গুণেই পকেটে রেখেছিলেন। এইমাত্র বিড়ি বার করতে গিয়ে পয়সাগুলোর হিসেব করে তার ভুল ধরতে পেরেছেন।

দোকানদার অবশ্য প্যারিমোহনবাবুকে চিনতেই পারল না। প্যারিমোহনবাবুকেই বুঝিয়ে দিতে হ'ল যে, খানিক আগে তিনি তার দোকান থেকে দুপয়সার বিড়ি কিনেছেন, এবং সে বিড়ির দাম দেবার জন্যে যে দোয়ানিটি দিয়েছেন দোকানদার তার ভাঙ্গানি ফেরৎ দিতে ভুল করেছে।

ভুল শুনেই দোকানদারের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। খেঁকিয়ে উঠে

বল্লে, "ক্যা ভুল হুয়া? দো পয়সাকে বিড়ি লেকে দো ঘণ্টা বাদ ভুল দেখানে আয়া!"

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেও প্যারিমোহনবাবুকে এবার ধৈর্য্য ধরে বুঝিয়ে দিতে হ'ল যে, তিনি দোকানদারের কাছে কিছু দাবী করতে আসেন নি, এসেছেন যে দুপয়সা সে ভুল করে বেশী দিয়েছিল তাই ফেরৎ দিতে।

দোকানদারের উগ্রতাটা একটু শান্ত হ'ল কিন্তু কণ্ঠস্বর বিশেষ মোলায়েম হয়েছে মনে হলনা। কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ওঠা, মাথার মাঝখানে অত্যন্ত বেমানান ভাবে টাক পড়া—ছেঁড়া কোট, তালি দেওয়া কাপড় পরণে ভাঙ্গা ছাতি হাতে এই মাঝবয়সী মানুষটিকে অদ্ভুত কোন জীববিশেষ হিসেবেই একটুখানি লক্ষ্য করে দোকানদার তাচ্ছিল্য ভরে বল্লে, "তব দিজিয়ে!"

প্যারিমোহনবাবু পয়সা দুটো তার হাতে দিতে নিতান্ত অবহেলা ভরে একটা টিনের কৌটায় সেটা ফেলে সে আবার জাল-বসান আগুনটার ওপর বিড়ির বাণ্ডিলগুলো সেঁকবার জন্যে সাজাতে লাগল। প্যারিমোহনবাবুর দিকে তার আর ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্যারিমোহনবাবু আবার বাড়ি যাবার পথ ধরলেন। আপনা থেকে পয়সা ফেরৎ দিতে হলে দোকানদারের যে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞাটুকু পেলেন, তাহাতে আহত না হবার মত অসাড় এখনও তিনি হননি, কিন্তু তবু এধরণের অবজ্ঞা অনেকটা এখন সয়ে গেছে। সাধারণতঃ মানুষের কাছে

অবজ্ঞাই এখন তিনি পেয়ে থাকেন, সে অবজ্ঞা করুণা বা সদয় সহানুভূতির আবরণে বরং আরো তিক্তই লাগে।

আজ রাখাল দফাদারের গদিতে যেমন হয়েছে। রাখাল তাঁহার বহু পুরাতন ছাত্র। যৌবনে শিক্ষাদানের সুমহৎ আদর্শ সামনে রেখে যখন প্রথম স্কুলমাষ্টারিতে ঢুকেছিলেন, তখন গোড়ায় পাঁচ ছয় বছরে যে সব ছাত্র তাঁর হাত দিয়ে পার হয়েছে রাখাল তাদের মধ্যে একজন। ছাত্র হিসেবে মোটেই ভাল ছিলনা, তার ওপর শয়তানি বুদ্ধিতে ছিল পাকা। ক্লাশে পাঁচটা 'হোম টাস্কের' বদলে দুটো অঙ্কই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে পাঁচটা বলে চালাবার চেষ্টা, পরীক্ষায় লুকিয়ে বই নিয়ে গিয়ে বা পরের খাতা দেখে টোকবার বদমায়েসীর জন্যে প্যারিমোহনবাবুর কাছে অনেক বকুনি, ধমক, কাণমলা, চড় সে খেয়েছে। প্যারিমোহনবাবু চিরকাল অত্যন্ত সিধে কড়া মাষ্টার বলে পরিচিত। ছেলেদের পড়াবার জন্যে তিনি চিরদিন প্রাণপাত করে এসেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে কোন ফাঁকি মিথ্যার এতটুকু প্রশ্রয় নেই। অন্যায় দেখলে তিনি বজ্রের মত কঠিন। প্যারিমোহনবাবুকে হাত করবার জন্যে কিনা বলা যায় না, রাখাল বাড়ীতে বলে বুঝিয়ে তাঁকে তার বাড়ির মাষ্টার হিসেবে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। তারই দরুণ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার বেড়া সে কোন রকমে টপকে পার হয়েছে বটে কিন্তু আর কিছু সুবিধা পায়নি। প্যারিবাবুকে দাম দিয়ে কেনা যায় না।

রাখালের প্যারিবাবুর প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধা না থাক কৃতজ্ঞতাটুকু ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে নিজের ছেলেকে পড়াবার ভার সে আপনা

থেকে ডেকে পাঠিয়ে প্যারীবাবুর ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। রাখালের ছেলে প্যারীবাবুর স্কুলে পড়েনা, প্যারীবাবুর স্কুলকে কাণা করে, শ' খানেক গজ দূরে বড় রাস্তার ওপর যে নতুন সৌখীন বড়লোকদের ছেলেদের অনেক বেশী মাইনের স্কুল কিছুদিন হল বসেছে, তার সে ছাত্র। তবু রাখাল প্যারীবাবুকে খাতির করে ডেকে পাঠিয়ে বলেছে, 'আপনার হাতে পড়েও আমি ত' আর মানুষ হলাম না, দেখুন আমার ছেলেটাকে যদি পারেন।' রাখাল তখন থেকেই ওই রকম আধা মুরুব্বিয়ানা আধা সম্মানের সুরে কথা বলে।

প্যারীবাবু সে সময়ে কাজটা পেয়ে অবশ্য বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁর দৈন্যদশা তখন থেকেই সুরু হয়েছে। পাড়ায় সৌখীন নতুন স্কুলটি হওয়ার দরুণ তাঁদের স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। নতুন স্কুলের প্রকাণ্ড জমকালো বাড়ি, তার ধরণধারণ চালচলন সবই উঁচু দরের। তাঁদের ভাঙা পুরোণ একতলা বাড়ির সেকেলে স্কুলে নেহাৎ নিরুপায় না হয়ে কেউ আর ছেলে পাঠায় না। স্কুল উঠে যাবার সম্ভাবনার ভয় দেখিয়ে সেক্রেটারী মশাই সব শিক্ষকেরই মাইনে কমিয়ে দিয়েছেন। ওদিকে দিনকাল তখন থেকেই খারাপ। ছেলেমেয়ে নিয়ে প্যারীবাবুর সংসারও তখন বেশ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। ছোট বড় সাতটি মানুষের দুবেলার অন্ন প্রতিদিন জোগাতে হয়।

রাখালের ছেলেও যথাসময়ে এই সেদিন স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে গেছে। তারই কিছু আগে পৃথিবীময় যুদ্ধ বেধেছে ও প্যারীবাবুর দুর্দ্দশা চরম সীমায় গিয়ে পৌছেচে। টিউশনি ও মাষ্টারীর আয়ে আগে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করে শাক ভাতের সংস্থান হত। লজ্জা নিবারন দূরের কথা, বাড়ি ভাড়া দিয়ে এখন তাতে শাকটুকুর ওপর ভাতের ব্যবস্থা করতেই কুলোয় না।

প্যারীবাবু অনেক ইতস্ততঃ করে, নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়ার পর আজ একটি বিশেষ আর্জি নিয়েই রাখালের কাছে গিয়েছিলেন। রাখাল এখন মস্ত ব্যবসাদার। তার ইটস্মুরকীর পৈতৃক কারবার যুদ্ধের বাজারের মিলিটারি কন্‌ট্র্যাক্টের দৌলতে রাতারাতি ফেঁপে উঠেছে। দশবিশটা লরি সারাক্ষণ তার আড়তে আসছে যাচ্ছে, নদীর ঘাটে টালি বালির ভরা দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না।

দাঁড়াবার জায়গা তার গদিতেও নেই। বাড়ীতে গিয়ে দেখা পাওয়া দুষ্কর বলে প্যারীবাবু রাখালের গদিতেই এসেছিলেন সকাল বেলা। ইটস্মুরকীর ব্যবসা হলে কি হয় রাখালের গদিতে এখন সাহেবী ব্যবস্থা। বাইরে সাবেকি কায়দায় খাতা পত্র বাক্স নিয়ে তার সরকার ইত্যাদি বসে, বাছাই করা ধনী মানী খদ্দেরদের খাতির করবার জন্যে রাখালের ভেতরে আলাদা ফ্যানফ্যাশনের অফিস ঘর। খবর না পাঠিয়ে সেখানে ঢোকা যায় না।

প্যারীবাবু অনেকক্ষণ ধরে ভেতরে খবর দেবার চেষ্টা করেছেন কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করেনি। অবশেষে বিরক্ত হয়ে একজন সরকার বলেছে, 'বলুন মশাই কি বলতে হবে গিয়ে। দেখছেন কিরকম কাজের ভীড়, নিঃশ্বাস ফেলবার কারু ফুরসুৎ নেই। এর ভেতর যত বাজে ফাই ফরমাজ! কাজ কারবার ছাড়া যদি দেখা করতে চান'ত বাবুর বাড়ী গেলেই পারেন। এটাত বৈঠকখানা নয়, ব্যবসার জায়গা!'

প্যারীবাবু শান্ত ভাবে বলেছেন, 'বাড়ী গিয়ে দেখা হয়নি বলেই এখানে এসেছি। আপনি শুধু একটু গিয়ে খবর দিন যে প্যারী বাবু এসেছেন। যদি তাঁর দেখা করবার সময় না থাকে আমি চলে যাব।'

প্যারীবাবুর দিকে একবার ভ্রূকুটি করে সরকার ভেতরে গেল খবর দিতে।

খবর পেয়ে কিন্তু রাখাল যে ভাবে নিজে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করেছে তাতে আবার কেউ হলে বেশ একটু গর্ব্বই বোধ করত। 'আরে মাষ্টার মশাই যে! আপনি এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, কি লজ্জার কথা। আপনার আবার খবর দেওয়া দেওয়ি কি! সটান অফিসে চলে আসবেন। আসুন আসুন।'

কাটা দরজাটা সে নিজেই ফাঁক করে ধরেছে মাষ্টার মশাইএর যাওয়ার সুবিধে করে দেবার জন্যে।

প্যারীবাবু ছাতিটি হাতে নিযে ভেতরে ঢুকেছেন। অফিসঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতা। প্যারীবাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত দামী মনে হয়েছে। কাদা মাখা ছেঁড়া জুতোয় সে কার্পেট মাড়িয়ে মোটা গদি আঁটা ঝকঝকে চেয়ারে তাঁর ময়লা ছেঁড়া পোষাক নিয়ে গিয়ে বেশ একটু সঙ্কোচই তাঁর হয়েছে। ঘরে আরো একজন আছে তিনি ভাবেন নি। ফিটফাট সাহেবী পোষাক পরা এই সব আসবাব পত্রের সঙ্গে মানানসই এক ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে নিজের পরিচ্ছদটা তুলনা করেই প্যারীবাবুর সঙ্কোচ হয়েছে বেশী। কিন্তু এ সঙ্কোচ ত ক্ষণিকের। এ সঙ্কোচকে আমল দিলে আজকের দিনে পথেঘাটে লোকসমাজে তাঁর বেরুনই বন্ধ করতে হয়। প্যারীবাবু তাই মন থেকে এটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রাখালই তার বদান্যতা আতিশয্যে বাদ সেধেছে। সগর্ব্বে বেশ একটু অনুকম্পা মিশ্রিত সম্মানের সঙ্গে ঘরের অপর ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেছে, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, সেন—আমার মাষ্টার মশাই—ছেলেবেলায়

আমায় পড়িয়েছেন,—পড়িয়েছেন, মানে গাধা পিটে মানুষ করেছেন আর কি!' নিজের উদারতা ও বিনয়ে নিজে মুগ্ধ হয়ে রাখাল হেসেছে।

সেন, কলের পুতুলের মত কেতা দুরস্ত ভাবে জ্যামিতিক সরল রেখায় ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ার ছেড়ে একটু ওঠবার ভঙ্গি করে হাত দুটো গলা পর্য্যন্ত তুলেছে, প্যারীবাবুও নমস্কার করেছেন। মাথা না নেড়ে কি করে শুধু চোখের তারা ওঠা নামায় কৌশলে কারুর আপাদ মস্তক সমালোচনা করা যায় সেনের দৃষ্টি থেকে প্যারীবা: প্রথম বুঝতে পেরেছেন। রাখাল তখন সোৎসাহে বলে চলেছে 'ওর এই চেহারা দেখে ভাবতেই পারবেন. কি ভয়টা ওকে আমরা করতাম। ঠিক বাঘের মত। চড়চাপড় কাণমলা কত c খেয়েছি!'

দাঁত না বার করে শুধু ঠোঁটদুটো একটু বিস্তৃত করে কি করে দায় সারা হাসি হাসা যায় সেনের মুখ দেখে প্যারীবাবু এবার শিখেছেন। এবার তাঁর সত্যিই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়েছে: কোন রকমে দরকারী কথাটা সেরে ফেলে যেতে পারলে তিনি বাঁচেন। বলেছেন, তোমার সময় নষ্ট করতে চাইনা রাখাল, আমার শুধু একটা কথা ছিল····

রাখাল বাধা দিয়ে বলেছে, 'আরে বসুন বসুন মাষ্টার মশাই। গদিতে পায়ের ধূলো যখন দিয়েছেন তখন অমনি কি আর ছাড়ি।'

ছাড়তে সে সত্যিই চায়না। নেহাত করে কোন যুগে ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন বলে জীবন-যুদ্ধের এমন পরাস্ত লবেজান সৈনিককে মনে রেখে খাতির দেখানর মধ্যে যে কতখানি উদারতা ও মহত্ত্ব আছে তা বোঝাবার এমন সুযোগ সে ছাড়তে পারে! তার অবস্থার আর

কেউ হ'লে এমন চেহারা ও পোষাকের কোন লোককে আমলই যে দিতনা, আর সে যে সেই লোকটিকে রীতিমত সশ্রদ্ধভাবে আপ্যায়িত করেছে, এমন একটা বাহাদুরী নেবার সুবিধে প্রতিদিন ত হয়না। পান সিগারেট আনিয়ে নানাভাবে খাতির করে সে প্যারীবাবুকে ব্যতিব্যস্তই করে তুলেছে। খানিক বাদে বলেছে, আপনার চেহারা কিন্তু বড় খারাপ হয়ে গেছে মাষ্টার মশাই কি ক্ষমতাই না আপনার গায়ে ছিল তখন ত দেখেছি। আর চেহারা খারাপ হবে নাই বা কেন! বুঝেছ সেন, আজকালকার দিনে যে যা পারে লুটে নিচ্ছে, সবাই আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ শুধু বেচারা মাষ্টারদেরই কপাল পুড়ে ছাই হয়েছে। সব কিছুর দর অমন তিনগুণ চারগুণ চড়া কিন্তু এঁদের মাইনে কমেছে বই বাড়েনি। কি করে তাতে চলে, বলতে পার?'

একটু থেমে অনুকম্পার আতিশয্যে প্যারীবাবুকে রাখাল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে, 'আচ্ছা স্কুলে এখন কত মাইনে পান মাষ্টার মশাই?'

প্যারীবাবু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছেন—পিন্ ফোটান পোকাকে যেন অনুবীক্ষণের কাঁচের তলায় ধরা হয়েছে। তবু বাধ্য হয়ে বলেছেন, 'ষাট টাকা পাই।'

'ষাট টাকা! তাওত আপনি খুব বেশী পান। এই ষাটের ওপর টিউশনি ইত্যাদি সব মিলিয়ে ধরলুম একশ টাকা আয়! ভেবে দেখ সেন। একশ টাকায় একটা মানুষের আজকাল চলেনা, একটা গোটা সংসার! একটা রিক্সাওয়ালা দিন আজকাল যত রোজগার করে জানত? অন্ততঃ চার টাকা। তবু তাদের লোকলৌকিকতা নেই ভদ্র সেজে থাকবার দায় নেই….'

সেন এবার বোধহয় এই একঘেয়ে আলোচনা আর সহ্য করতে না পেরেই বিদায় নিয়েছে। রাখাল, শ্রোতা ও দর্শকের অভাবে একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তার পর বলুন মাষ্টার মশাই, কি জন্যে পায়ের ধূলো দিয়েছেন!'

প্যারীবাবু সমস্ত সঙ্কোচ কোনরকমে জয় করে কথাগুলো বলেছেন। রাখালের ছেলে এখন আর স্কুলে পড়েনা, তবু তার অঙ্কের টিউশনিটা প্যারীবাবুকে দিলে তিনি করতে পারেন। আর কিছু না হোক কলেজের অঙ্ক শেখাবার মত বিদ্যা তাঁর আছে, রাখালত জানে। রাখাল ছেলেকে পড়াবার বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্যে আলাদা টিউটর রাখবার ব্যবস্থা করেছে জেনেই কথাটা তাঁর মনে হয়েছে।

রাখাল বেশ একটু গর্ব্বের সঙ্গে বলেছে, 'না রেখে আর কি করি বলুন, আমারই ত ছেলে। নিজের মুরোদ যে ওর কত তা ত আমার জানতে বাকী নেই। এই দেখুন না, একজন ইংরেজির, একজন লজিকের ত এর মধ্যেই এসে জুটেছেন, অঙ্কেরও একজন না রাখলে নয়!'

প্যারীবাবু আশান্বিত হয়ে বলেছেন, 'সেই জন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

'তা বেশ করেছেন, আপনি হ'লে ত ভালোই হয়।' রাখাল হঠাৎ যেন একটু চিন্তিত ভাবে বলেছে, 'তবে কি জানেন, স্কুল থেকে কলেজে ঢুকলেই ছেলেদের মাথাগুলো একটু গরম হয়ে যায় কিনা। স্কুলের মাষ্টারদের তখন মনে করে—ওই কি বলে, 'ওল্ড ফসিলস্' কলেজের প্রফেসারের কাছে না পড়লে বাবুদের তখন মান থাকেনা। আচ্ছা, তবু আমি বুঝিয়ে বলে দেখব'খন। আপনি বরং খোঁজ নেবেন এর মধ্যে একদিন।'

প্যারীবাবু আর কিছু না বলে উঠে পড়েছেন এবার। তাঁর মত অবস্থা হ'লে আর কেউ বোধ হয় আর একবার পেড়াপেড়ি করত, কিন্তু তাঁর দ্বারা তা সম্ভব নয়।

রাখালও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবার সহৃদয়তায় গলে গিয়ে বলেছে, 'আমি বলি কি, মাষ্টার মশাই, এ লাইনটাই ছেড়ে দিতে পারেন না? সারাজীবন মাষ্টারী করে ত দেখলেন, জাতও গেল পেটও ভরলনা। আমাদেরই শশাঙ্কবাবু, স্কুল ছেড়ে চোরাবাজারে ঢুকে কি রকম ফেঁপে উঠেছেন জানেন ত! পুকুরকে পুকুর চুরি করে মেরে দিচ্ছেন। মাষ্টারী নিয়ে পড়ে থাকলে কি আর হত! উপোষ করে দিন যেত ত! আপনি যদি রাজী থাকেন ত বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই সেনেরই একজন লোক দরকার, বলছিল, কেয়াতলা না কোথায় ওর বাইরের কাজ দেখবার জন্যে। একটু সুবিধে মাফিক চোখ দুটো বুজিয়ে রেখে হাত বাড়াতে পারলে দেখবেন, হাত মুঠো করতে পারছেন না—লক্ষ্মী হাত উপচে পড়ছে।'

প্যারীবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু হেসে রাখাল আবার নিজে থেকেই বলেছে, 'আপনার কি মনে হচ্ছে, বেশ বুঝতে পারছি। কাণ দুটো আমার মলে দিয়ে আবার বেঞ্চির ওপর দাঁড করিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, কেমন না? কি বলব বলুন, এই রোগেই ত আপনারা মারা যাচ্ছেন। শয়তানের রাজ্যে টিকে থাকতে হ'লে শয়তানী না করে উপায় নেই এই সোজা কথাটা আপনারা কিছুতেই বুঝবেন না।'

প্যারীবাবু গম্ভীর ভাবে বলেছেন, 'আমি তাহলে আসছে রবিবার আসব।'

'বেশ, তাই আসবেন।' বলে রাখাল তাঁকে এবারেও দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সসম্মানে নমস্কার করে বিদায় দিয়েছে।

প্যারীবাবু ক্লান্তদেহে যখন বাড়ী ঢুকলেন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। অনেকখানি রাস্তা হেঁটে যেতে হবে বলে, সকাল বেলা কিছু মুখে না দিয়েই তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পড়েছিলেন। ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে ইচ্ছে ছিল একটু চা খাবার। কিন্তু রবিবার বলে উনুনে এখনো আঁচ পড়েনি। কয়লার যা দাম, তাতে বুঝেশুঝে উনুন ধরাতে হয়। দুবেলা উনুন ধরাবার দরকারই থাকেনা, অনেকদিন রাঁধবার জিনিষের অভাবে। অভাব যেদিন থাকেনা, সেদিনও প্যারীবাবুর স্ত্রী হেমলতা একবেলার বেশী আগুন জ্বালেন না। দুবেলা রান্না করার বিলাসিতা করবার মত অবস্থা তাঁদের অনেক দিন ঘুচে গেছে।

গলির মধ্যে একটি অত্যন্ত পুরোণ জীর্ণ দোতালা বাড়ির নীচের দুটি অন্ধকার স্যাৎসেতে ঘর প্যারীবাবু আজ বিশ বছর ধরে ভাড়া করে আছেন। বিশ বছরেব মধ্যে কোনদিন সে বাড়ির সংস্কার হয়েছে কিনা সন্দেহ। দেয়ালে হাত লাগলে চূণবালি ঝর ঝর করে খসে পড়ে, জানালা দরজাগুলো এমন নড়বড়ে যে মনে হয় খুলতে বন্ধ করতেই কোন দিন দেয়াল থেকে আলগা হয়ে আসবে। ঘর দুটির সামনে সঙ্কীর্ণ একটি রকের একদিক দরমা ও চটে ঘিরে রান্নার যায়গা করা হয়েছে, আর একদিকে একটি ভাঙ্গা তক্তপোষ পাতা আছে। সেইটেই প্যারীবাবুর বৈঠকখানা ও সময় পেলে বিশ্রামের জায়গা।

প্যারীবাবু ছাতাটি দেয়ালের ধারে রেখে ক্লান্ত ভাবে সেই তক্তপোষের ওপর এসে বসেন। হেমলতা রান্নাঘরের পাশে এক বালতি জল দিয়ে বাড়ির ছিন্ন ময়লা কাপড়চোপড় সাবান দিয়ে যথাসম্ভব পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন। স্বামীকে দেখে অভ্যাসের দরুণ সাবান মাখা হাতের

কনুই দিয়ে মাথায় শাড়ীর একটা প্রান্ত তুলে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাঁক দেন, অ উমা, তোর বাবাকে রান্নাঘরের পাখাটা দিয়ে যা ত !

প্যারীবাবু কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছছিলেন। মেজ মেয়ে উমা এসে পাখাটা দেবার সময় তিনি অবাক হয়ে তার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকেন। উমা চলে যাবার পর অবাক হবার কারণটা যেন তার হৃদয়ঙ্গম হয়। স্ত্রীকে ডেকে বলেন, 'এদিকে একটু শোন।'

'কাপড় কাছচি দেখতে পাচ্ছনা। বলনা ওইখান থেকেই।'

প্যারীবাবু গম্ভীরস্বরে বলেন, 'না এইখানে শুনে যাও।'

এ গলার স্বর অমান্য করা যায়না। হেমলতা সাবান মাখা হাতেই উঠে এসে বলেন, 'বল, কি বলছ !'

তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্যারীবাবু বলেন, 'উমা নতুন একটা শাড়ী পরেছে দেখলাম !'

'হ্যা পরেছে তা হয়েছে কি। মেয়েদের কি নতুন শাড়ী পরতো নেই।'

'পরতে আছে, কিন্তু শাড়ী এল কোথা থেকে ?'

'কাল ওর জন্মদিন ছিল তাই পেয়েছে।'

প্যারীবাবু কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়েই বুঝি কথা বলতে পারেন না। এ বাড়িতে কারুর জন্মান এমন একটা সৌভাগ্য নয় যে ঘটা করে এ পর্য্যন্ত কোনদিন তা স্মরণ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খানিক বাদে কঠিন স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—'কে দিয়েছে ?'

'পুলিনবাবু দিয়েছে ! নাও হ'লত। মেয়ে একটা নতুন শাড়ী পরেছে, তার জবাবদিহি দিতে দিতে জান গেল।' হেমলতা আবার তাঁর কাপড় কাচার জায়গায় ফিরে যান। নিজের মনের কোন একটা

সঙ্কোচ ঢাকবার জন্যেই তাঁর কণ্ঠে যে এই অতিরিক্ত ঝঙ্কার তা কিন্তু বুঝতে বাকি খাকে না।

প্যারীবাবু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। পুলিনবাবু শাড়ী দিয়েছে। বছর খানেক আগে তাঁর স্ত্রীই এই পুলিনবাবুর সম্পর্কে কি বলেছিল স্পষ্ট তাঁর মনে আছে। বেশ একটু রাগের সঙ্গেই হেমলতা সেদিন জানিয়েছিলেন, 'দেখ ওই পুলিনবাবু লোকটির ধরণধারণ আমার ভাল লাগছেনা কিন্তু।'

পুলিনবাবু আবার কে!, প্রথমটা বুঝতে না পেরে প্যারীবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'ওই যে গলির মোড়ের বড় বাড়িটা যাদের--চেন না।'

চিনতে পেরে প্যারীবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তা কি করেছে সে?'

'করে নি কিছু, কিন্তু ওরা হ'ল বড়লোক, আমাদের মত গরীব দুঃখীর সঙ্গে অমন গায়ে পড়ে আলাপ করার অত গরজ ওদের কিসের! নেপুর সঙ্গে ভাব করে প্রথম একদিন বাড়িতে এল, তারপর আজকাল যখন-তখন হামেশাই ত' আসছে। "কেমন আছেন মাসিমা।" "এই একটু. ঘুরে গেলাম মাসিমা"—আমি যেন ওর কোনকেলে কেনা মাসিমা।

'তা মাসিমা বল্লে দোবটা কি?'

'দোষটা কি বুঝতে পার না! উমা যে বড় হয়েছে সে খেয়াল আছে? লোকটির স্বভাবচরিত্র জানতে পাড়ায় ত কারুর বাকী নেই। স্ত্রীকে মেরেধরেই বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে, না মনের দুঃখে সে নিজেই বিদেয় হয়ে গিয়েছে কেউ জানেনা। আমাদের ওপর অত দরদ ওর কিসের? সেদিন বলে কিনা, "উমার যা মিষ্টি গলা, আমি ওকে গান শেখাব মাসিমা!" আমি ও বল্লাম, আমাদের মত গরীবের ঘরের মেয়েরা

রে ধেবেড়ে বাসন মেজে চুল বাঁধবারই সময় পায় না, গান শিখে তাদের কি হবে।" বল্লে হবে কি, লজ্জা ত নেই, বেহায়ার মত আবার তবু আসে।'

পুলিনবাবু যে তবু আসে প্যারীবাবু তা সবসময়ে চোখে না দেখলেও জানেন। কিন্তু উমাকে জন্মদিনের নামে তার শাড়ী দেওয়া পর্য্যন্ত যে হেমলতার প্রশ্রয় পেতে পারে এতটা তিনি ভাবতে পারেন নি। গোড়ায় গোড়ায় ছেলেমেয়েরা পুলিনবাবুর সঙ্গে বায়স্কোপ থিয়েটারে যাবার জন্যে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে এসেছে। নিজে থেকে কোন উৎসব আনন্দের সুযোগ দেবার ক্ষমতা নেই বলেই তাদের আশাভঙ্গ করতে তিনি পারেন নি। আজকাল অনুমতি নিতে কেউ আসে না। পুলিনবাবুর সঙ্গে যাওয়া বন্ধ হয়েছে বলে নয়' এ বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তার এত বেড়েছে যে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আর কেউ অনুভব করে না।

প্যারীবাবু সরল ও সত্যাশ্রয়ী বলে নির্ব্বোধ নন। শুধু এতদিন তাঁর দৃষ্টি নিজের দুশ্চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল। এ ঘনিষ্ঠতার আসল চেহারা আজ এই শাড়ীটির সাহায্যে তার সমস্ত জঘন্যতা নিয়ে তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই জীর্ণ বাড়িটার সমস্ত শ্রী ও শালীনতার আবরণ যেমন ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে, তার দুর্ব্বল ইটগুলো যেমন নোনাধরার বিষক্রিয়া ঠেকাতে না পেরে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ তাঁর সংসারেও সেই পরিণাম তিনি চোখের ওপর দেখতে পান। অভাবের ছিদ্রপথে কলুষ ও গ্লানি এ সংসারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।

অভিভূত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা গোলমালে তাঁর চমক ভাঙে। বড় ছেলে দেবু সব চেয়ে ছোট নেপুকে কাণ ধরে বাইরে থেকে নিয়ে এসে হেমলতার কাছে ক্রুদ্ধ স্বরে বলছে, 'শোন মা তোমার ছোট ছেলের কীর্ত্তি। উনি চুরি বিদ্যেতে পর্য্যন্ত

পাকা হয়েছেন। পাশের বাড়িতে বন্ধুর সঙ্গে পড়ার বই আনবার ছুতো করে গিয়ে ঘরের দেরাজের ওপর থেকে....

হেমলতারই নিঃশব্দ ইঙ্গিতে বাবার উপস্থিতি টের পেয়ে দেবু হঠাৎ চুপ করে যায়। প্যারীবাবুর মাথায় তখন কিন্তু আগুন জ্বলে উঠেছে। পাখাটা হাতে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেন 'কি চুরি করেছে নেপু? কি চুরি করেছে?'

তাঁর এমন চেহারা হেমলতা জীবনে কখনও দেখেন নি। তিনি ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকেন। দেবু ও নেপু দুজনের কারুর মুখ দিয়েই কথা বার হয় না।

'বল কি চুরি করেছিস্', বলে প্যারীবাবু পাখার বাঁটটা তোলেন। কিন্তু নেপুর গায়ে তার আঘাত আর পড়ে না। হাত তুলেও খানিকক্ষণ কেমন অদ্ভুত ভাবে নেপুর দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে পাখাটা তিনি নামিয়ে নেন। তারপর পাখাটা সেইখানে ফেলে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস-রাখা ছাতাটা হাতে নিয়ে, কোন দিকে না চেয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

পিঙ্গল

ছেলেগুলো আজ-কাল দু'-চারটে ইংরিজি কথা শিখে ফেলেছে। 'ইয়েস', নো' শুধু নয়, 'ভেরী হাংরী সাব', 'নো ফুড টু ডেজ্ সাব', 'ওনলি টু পাইস্ সাব!' তারা বেশ গড়্-গড়্ করে বলতে পারে। ইংরেজ মার্কিণের তফাৎ পর্য্যন্ত তারা বোঝে। বলে, 'ইউ ম্যারিক্যান সার। ম্যারিক্যান ভেরী গুড্, বৃটিশ ভেরী পুওর।' আবার ইংরেজ দেখলে বলে, 'বৃটিশ ভেরী বোল্ড সাব—বৃটিশ ফাইট্।' শুনে সৈনিকদের কেউ কেউ হাসে, কেউ কেউ দু'আনা চার আনা ছুড়ে দেয়, আবার কেউ বুট তোলে। ছেলেগুলো খিল-খিল করে হেসে প্ল্যাটফর্মের আর এক প্রান্তে সরে পড়ে।

ছোট একটা জংশন-ষ্টেশন। আগে দু'-চারটে ট্রেণ দিন-রাতের মধ্যে পার করে বিশাল প্রান্তরের মধ্যে সারাক্ষণ ঝিমোত।

যুদ্ধের বাজারে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরের মত হঠাৎ ফেঁপে-ফুলে একেবারে রাতারাতি চেহারা বদলে গেছে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেণ দাঁড়ালে, ষ্টেশনের পূব দিকে যে পাথুরে ঢিবিটা এত দিন দিগন্ত আড়াল করে থাকত, ফতেচাঁদ সিঙ্ঘির হাজার কুলি-কামিন ছ-মাসের মধ্যে গাঁইতি কোদাল শাবলে সেটা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেখানে তিন তিনটে সাইডিং বানিয়ে ফেলেছে। পশ্চিমের পাথুরে বাঁজা মাঠটাও রেহাই পায়নি। রেলের আরো একটা লুপ সেখানে বসান হচ্ছে। অমন চার-পাঁচটা বড় বড় নতুন গুদাম ঘর তৈরী হয়েছে। লোক-লস্কর ইঞ্জিন-মালগাড়ি মোটর-লরীতে ষ্টেশন গম্‌গম্ করছে রাত-দিন। যুদ্ধের সরঞ্জাম-বোঝাই মালগাড়ি ত যাচ্ছে হরদম। দেশী-বিদেশী সৈন্যদের যাওয়া-আসারও কামাই নেই।

ছেলেগুলো এইখানেই ঘুরে বেড়ায়। ষ্টেশনেই তাদের ঘর-বাড়ি। আত্মীয়-স্বজন হয়ত তাদেরও একদিন ছিল, কিন্তু সে সব তাদের মনে

নেই। কোথাও কোন সম্বন্ধের ধার তারা আর ধারে না। মেদিনীপুরের ঝড়ে ও বন্যায় তাদের অধিকাংশ এইখানে ছিট্‌কে এসে পড়েছে। কেউ বা এসেছে আপনা থেকে, চিরদিন অনাবশ্যক মানুষের জঞ্জাল যেমন করে এসে এখানে সেখানে জোটে, তেমনি করে।

তারা লোক বুঝে ভিক্ষে চায়, কিন্তু ভিখিরী তারা নয়। সুবিধে পেলে তারা চুরি করে—কিন্তু চোরও তাদের বলা যায় না। লোহা-লক্কড ইঞ্জিন-মালগাড়ির জগতের তারা এক নতুন জগতের বেদে। সময়ের অসীম স্রোতে প্রতি মুহূর্ত্তের ঢেউএর ওপরে তারা কোন রকমে ভেসে থাকে, সামনে বা পেছনের কোন হিসেব রাখে না।

দু'-চারটে এখন তখন তলিয়েও যাচ্ছে। কাল যেমন সেই পা-খোঁড়া বিনি বলে মেয়েটা কাটা পড়ল, লাইন পার হতে গিয়ে মালগাড়ীতে। মেয়েগুলোর অমনি মরণ-দশা। নইলে সবাই ত তারা ছিল সেখানে। সকালে হঠাৎ কোথা থেকে খবর এসেছিল লাইনের মাঝখানে একটা মালগাড়ির বল্টু রাতারাতি খুলে একটা কব্জা খানিকটা কে ফাঁক করেছে। সেখানে তারের খোঁচা দিলে চাল গড়িয়ে পড়ছে। পঙ্গপালের মত তারা সবাই গিয়ে জুটে আঁজলা-আঁজলা চাল বার করে নিয়েছে। তার পর চৌকিদারের সাড়া পেয়ে সবাই দিয়েছে ছুট্। খরগোশের মত তারা সতর্ক—ইঁদুরের মত চালাক। তাদের ধরবে কে! মাল-গাড়ির তলা দিয়ে গলে, রেলের তার টপকে দেখতে দেখতে তারা সবাই হাওয়া। শুধু খোঁড়া বিনি পারেনি। একটা মালগাড়ি সান্টিং হচ্ছিল। দিশেহারা হয়ে পড়বি ত পড় তারি সামনে। খানিকটা রক্ত মাংসের ডেলা ছাড়া আর কোন চিহ্ন তারপর তার পাওয়া যায়নি। কোঁচড়ের চাল গুলো চারিধারে ছড়িয়ে পড়েছে। যেগুলো রক্তে মাখামাখি হয়নি সেগুলো অনেকে তার পর কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। নেয়নি শুধু নিধে। দূরে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে সে থুতু ফেলেছে আর বলেছে, 'ছোঃ মেয়েগুলো অমনি আহম্মুক বটে। মরেছে, আপদ গেছে!'

মেয়ে তাদের দলে বেশী সত্যিই নেই। থাকলেও বেশী দিন টেঁকে না। সবাই কাটা অবশ্য পড়ে না, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। মনে পড়ে শ্যামা বলে সেই রোগা কালো মেয়েটাকে—হাড্ডি-সার কাঠির মত চেহারা। কিন্তু কারুর কারুর হাড়েরও একটা শ্রী থাকে। মেয়েটার তাই ছিল। গোরা পল্টনগুলোর কাছে সব চেয়ে বেশী পয়সা সেই আদায় করত। নটবরের চা-মিষ্টির ষ্টলে ঝড়তি পড়তি বাসি খাবারের টুকরোর বরাদ্দ তার কোন দিন সকালবেলা বাদ যায়নি। নিধের সঙ্গে ওই একটা মেয়েই পাল্লা দিয়ে রেষারেষি করেছে। মেয়েটার মধ্যে কি যেন একটা ছিল একটু আলাদা। কথাবার্ত্তা বেশী কখনো বলত না। একা একাই থাকত বেশী। সৌখীনও ছিল এরি মধ্যে। কাপড়টা এমন করে পরত যেন তার গেরো আর তালিগুলো চোখেই পড়ত না। ষ্টেশনের ওপারের বাজারে রামজীবনের মুদিখানা থেকে কখন কি ফিকিরে যে তেল জোগাড় করে মাথায় মাখত কেউ জানে না। চুলগুলো তার শণের নুড়ি ছিল না, আর সবাইকার মত। সাঁওতাল মেয়েদের মত সেই চুল ফিরিয়ে এক পেশে খোঁপা বেঁধে ফুলও তার একটি গোঁজা চাই রোজ। সব চেয়ে অদ্ভুত ছিল মেয়েটার চোখ। সাইডিংএ সে-বার ক'দিনের জন্য একটা মিলিটারি ট্রেণ দাঁড় করান ছিল। মার্কিণ পল্টনের ট্রেণ। শুধু একটা প্যাণ্ট পরে একেবারে আদুড় গায়ে গোরাগুলো দিন-রাত গরমে আইঢাই করত। বোতল বোতল বিলিতি ঠাণ্ডা তাড়ি খেত আর হৈ-হুল্লোড় করত। দু' চার টুক্‌রো রুটি, টিনেপোরা মাছের আচারের একটু আধটু বাকী বকেয়া, দু' চারটে বিস্কুট তাদের কাছে গেলেই পাওয়া যেত। গোড়ায় গোড়ায় তখন, লালমুখো পল্টনের সঙ্গে

বেশী পরিচয় তাদের হয়নি। সবাই একটু সমীহ করে ভয়ে ভয়েই থাকত। কিন্তু শ্যামার ছিল নিধের চেয়েও বেশী দুঃসাহস। গাড়ির ছায়ার দিক্‌টায় গড়া গড়া পাঁচ-ছটা লাল-মুখো পল্টন বসে বিলিতি তাড়ি খাচ্ছে। শ্যামা সেখানে গিয়েই একেবারে তাদের কাছ ঘেঁসে বসে বলত, "খিদে পেয়েছে সাহেব, দে না দুটো পয়সা, মুড়ি কিনে খাব।" বাংলা তারা বুঝত না, চাইবার ভঙ্গিটা কিন্তু তাদের অজানা নয়। কেউ এক-জন ঠাট্টা করে হেসে বিয়ারের বোতলটা দেখিয়ে নতুন শেখা হিন্দিতে বলত, 'পিয়ে গা ?' শ্যামা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠত—'মরণ দশা তোমাদের।' মানে না বুঝলেও মুখভঙ্গিটা উপভোগ করে তারা হাসত। কেউ বা রেগে যাবার ভাণ করে বলত, 'ভাগো ভাগো, মারেগা।' মার-মুখো ভঙ্গি দেখে আর সবাই দূরে সরে যেত কিন্তু শ্যামা সে মেয়ে নয়। 'ঈস্‌, মেরেই দেখ না একবার লাল-মুখো ভূত।' বলে ঠায় বসে থাকত। পয়সা না আদায় করে সে উঠবে না।

সাহেবেরাও তাকে দুদিনেই চিনে নিয়েছিল। সে এলেই বল্‌ত, 'হিয়ার কমস্‌ দ্য ব্ল্যাক স্নেক!' রেলকণ্ট্রাকটার ফতেচাঁদ সিঙ্কির আড়কাঠি লালমোহন, সেও তখন থেকেই গোরা পল্টনদের গা ঘেঁষে ঘেঁষে আলাপ করার জন্যে ঘুরঘুর করত। সময় পেলেই তাদের কাছে গিয়ে ভিড়ত। গোরাদের কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে সে বলত 'রাইট্‌ সার রাইট্‌! সি বাইট্‌স লাইক এ স্নেক্‌—একদম কালা কেউটে সাপ।' পল্টনদের বোঝাবার জন্যে সে ডান হাতের কব্জির কামড়ের দাগটা পর্য্যন্ত দেখিয়ে দিত। গোরাগুলো একবার লালমোহনের কব্জির দিকে একবার শ্যামার দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে কি বলে হাসাহাসি করত, তার পর শ্যামাকে 'বলত, "তুম্‌ সাঁপ হ্যায়?" শ্যামার চোখ দুটো সাপের মতই জলে উঠত—হিংস্র ভাবে লালমোহনের দিকে তাকিয়ে সে বলত "সাপই ত

বটে! সেদিন শুধু হাতটা কামড়ে দিয়েছি, এবার একদিন চোখ দুটো ছুবলে নেব কুত্তাটার!" গোরারা এসব কথার মর্ম্ম বুঝত না কিন্তু মুখে তাদের সঙ্গে হাসলেও লালমোহনের ঠোঁটের দুটো পাশ কেমন একটু কুঁচকে যেত কুৎসিত ভাবে।

এই শ্যামাও একদিন হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল। রাত্রে ছেলেগুলো যখন যেখানে স্থবিধে হয়, দল পাকিয়ে শোয়। শুক্নো থাকলে প্ল্যাটফর্মেরই ওপর, বৃষ্টি হলে যেখানে একটু ছাউনি জোটে। শ্যামা কিন্তু রাত্রে দল ছাড়া হয়ে কোথায় যে কোন্ দিন শুত তার ঠিক নেই। কখনো ফাঁকা একটা মালগাড়ির ভেতরে, কখনো জলের ট্যাঙ্কের মাথায়। নিধে কতদিন তাকে ভয় দেখিয়ে বলেছে,—'একা শুস্ যেখানে সেখানে, কোন্ দিন রাত্রে নিয়ে যাবে ধরে!'

একদিন রাত্রে শ্যামা সত্যিই উধাও হয়ে যাবে তখন কি কেউ ভেবেছে। সকালে নটবরের ষ্টলে তাকে দেখা গেল না, তারপর আর কোন দিনই নয়। শুয়েছিল হয়ত কোন মালগাড়িতে; রাত্রে কোন মুলুকে চালান হয়ে গেছে! কেউ বা বল্লে, রাত্রে তিন নং সাইডিংএ কার যেন কান্না আর চীৎকার শোনা গেছে। কেউ বা চুপিচুপি জানালে লালমোহনের হাত আছে ব্যাপারটায়।

হয়ত আছে। এ বিষয়ে লালমোহনের স্থনাম কারুর অজানা নয়, কিন্তু কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়। প্ল্যাটফর্মে অমন উড়ো পাতা কত এসে পড়ে। আবার কোথায় উড়ে যায় দমকা হাওয়ায়। তা ছাড়া লালমোহন বড় সোজা লোক নয়। আড়কাঠি থেকে ফতেচাঁদের কুলিদের দিনমজুরী দেবার সরকার হয়েছে সে আজকাল। হাজার দু'হাজার কুলির জিয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি তার হাতে। ফতেচাঁদ সিঙ্কি বড় বিচক্ষণ কণ্ট্রাকটার। যত কুলিকামিনই লাগুক তার ভাবতে হয় না। পয়সা দিলে এখন চাল

মেলে না কোথাও। সে তাই দিন-মজুরীর বদলে চাল মেপে দেয়। মস্ত বড় গুদামে তার রাশি রাশি চাল ডাল মজুত। সে গুদামের ভার লালমোহনের ওপর। সেই মজুরী-মাফিক চাল ডাল বেঁটে দেয় সকলকে।

শ্যামার কথা সবাই ভুলে গেছে! নিধেও গেছে। প্রতিদিনের স্রোতে তারা ভেসে যায়, মনও তাদের স্রোতের মত, কিছু সেখানে বুঝি দাঁড়ায় না। শুধু নিধের মনে কেমন একটা আক্রোশের আগুন আছে লালমোহনের বিরুদ্ধে। লালমোহনকে জব্দ করবার স্থবিধে পেলে সে ছাড়বে না। কিন্তু গায়ের ঝাল মেটাবার সময় কই! দিন-কাল একেবারে বদলে গেছে এই কিছুদিনের মধ্যে। পেটের জ্বালা নিবোতেই সারা দিন-রাত চোখ-তুটো জ্বেলে রেখে সজাগ থাকতে হয়। বড় কঠিন লড়াই। আশ-পাশের সমস্ত গাঁ ভেঙ্গে মেয়ে-মদ্দ বাচ্চা-বুড়ো এসে ষ্টেশনে ভীড় করেছে—কোথাও এক দানা চাল নেই। তাদের হাহাকারে ষ্টেশনে কান পাতা যায় না। ট্রেণগুলো আসে, সারা গায়ে, গিজ্ গিজ্ করা মাছির মতন মানুষ যেন লেপ্টে নিয়ে। ছাদে মানুষ, জানালায়, দরজায়, হাতলে, সর্ব্বত্র মানুষ ঝুলছে। বিলাসপুরে না কোথায় না কি চাল এখনো সস্তা। বিনা টিকিটে ঝুলতে ঝুলতে তাই মেয়ে-মদ্দ সবাই চলেছে সে চাল কিনে আনতে। তাও নিজের পয়সায় নিজের জন্য নয়। ফন্দিবাজ এক দল ব্যবসাদার ঝোপ বুঝে এই বুদ্ধি খাটিয়েছে। বিলাসপুরে আছে তাদের লোক-জন। সেখানে গিয়ে পৌছতে পারলে তারাই নিজেদের পয়সায় এদের চাল কিনে দেয়। সে চাল আবার বিনা টিকিটে রেলের লোককে এড়িয়ে যথাস্থানে এনে পৌছে দিলে তার কিছু ভাগ মেলে। কাতারে কাতারে লোক তাই ট্রেণ ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলছে, ট্রেণের তলায় পর্য্যন্ত রডের ওপর শুয়ে শুয়ে যেতে তাদের আপত্তি নেই। রোজ অমন বিশ-

পঁচিশটা পড়ছে, হাত পা ভাঙছে, কাটা পড়ছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে কুকুর-তাড়া খেয়ে দূরে সরে যাচ্ছে, আবার ট্রেণ ছাড়তে না ছাড়তে প্রাণের মায়া ছেড়ে এসে লাফিয়ে উঠছে।

যারা যেতে পারছে না, ষ্টেশনে তারাই হন্যে হয়ে ফিরছে পেটের জ্বালায়। তাদের সঙ্গেই খাবার নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই।

আগে এমনটা কখনও হয়নি। কোথা থেকে কখন কি জুটবে জানা থাকত না বটে কিন্তু উপোষ করতেও হত না।

নিধে অবশ্য আজ-কাল অনেক বেশি সেয়ানা হয়েছে। গোরা পল্টনদের হাল-চাল সব তার এখন জানা। নির্ভয়ে তাদের মধ্যে সে ঘোরে-ফেরে। কি করে তাদের কাছে কি বাগাতে হয় সে জানে। সুবিধে হলে চুরি-চামারীও বাদ দেয় না। কোন সাইডিংএ পল্টনের কোন ট্রেণ এসে দুচার দিন দাঁড়ালে তার বিশেষ ভাবনা থাকে না। কিন্তু লালমোহন সেখানেও আজকাল তার শনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুবার তারই শয়তানীতে চোর বলে ধরা পড়ে মার খাওয়া থেকে নিধে কোন রকমে পালিয়ে বেঁচেছে। তার পর দু'চার দিন আর ষ্টেশন মুখো হতে পারেনি। ষ্টেশনের বাইরে বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছে মন-মরা হয়ে। ষ্টেশন তার জীবন। আর কোথাও নিশ্বাস নিয়েও যেন তার সুখ হয় না ষ্টেশনের অন্ধি সন্ধি সব তার জানা। ইঞ্জিনের হুইসিল আর গাড়ির সাণ্টিংএর শব্দ না শুনলে তার ঘুমই আসে না। ভোরের আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে প্ল্যাটফর্মের ঝাঁকড়া আবছা গাছগুলো যখন অসংখ্য সবে জেগে-ওঠা চড়ুইদের কিচি-মিচিতে গানের মেঘের মত ষ্টেশনের ওপর ভাসে, তখন সেই কলরব শুনে না জাগলে সত্যি করে সকাল হয়েছে বলেই তার মনে হয় না।

নিধে তারপর আবার ষ্টেশনে ফিরে এসেছে বটে কিন্তু সারাক্ষণ তাকে ভয়ে ভয়ে সাবধানে থাকতে হয়। কখন লালমোহনের হাতে পড়ে

যাবে তার ঠিক নেই। লালমোহন এখন ভয় করবার মত লোক বটে। ঘুষে বখ্‌শিষে সমস্ত ষ্টেশন তার হাতের মুঠোয়। ফ্যা-ফ্যা করে কাঙাল ভিখিরী মেয়েদের সঙ্গে দুটো ফষ্টি নষ্টি করবার জন্যে যে ঘুরে বেড়াত, বাজারের মাঝখানে তার মালগুদামের অফিসঘরে এ তল্লাটের হোমরা চোমরারা এখন গিয়ে মাঝ-রাতের মজলিশ জমায়। একবার আঙ্গুল মটকালে দু'চারটে ঘাড় মটকাবার ক্ষমতা সে রাখে। নিধে তার কাছে নেহাৎ একটা নোংরা ছুঁচোর সামিল। তবু নিধের ওপর তার আক্রোশের অন্ত নেই। তার কারণও আছে।

বিনা-টিকিটে চাল কিনতে যাওয়ার হিড়িকে রেল-লাইন দিয়ে মানুষের যেন বন্যা বয়ে চলেছে রাত-দিন। সেই বন্যায় ভেসে-যাওয়া পুরুষ-মেয়ের পাল হরদম এ ষ্টেশনে এসেও ভিড়ছে, বিছিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের ওপর বনের ভাঙা ডাল-পালার মত। ভিন জায়গার লোক, দুদিনের জন্যে এসে ষ্টেশনে আশ্রয় নেয়। কিছুই তারা জানে না এখানকার ব্যাপার-ট্যাপার। মেয়েরা এক জায়গায় দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে,—রাত্রে কোথা থেকে হঠাৎ ফিস্‌ফিসে-গলায় খবর আসে—কাছেই কোন মালগুদামের দেওয়াল ফুটো হয়েছে—একবার গিয়ে পেঁছিতে পারলেই কোঁচড়ভর্ত্তি চাল! সবাই হয়ত বিশ্বাস করে না। কিন্তু পেটের জ্বালায় মাথার ঠিক থাকবার কথা নয়। মরিয়া হয়ে যারা যায়, তাদের সবাই আর ফেরে না। বাছাই করা দু'চারটে অন্ধকারে একেবারে গায়েব হয়ে যায়।

এমন খবর প্রায়ই আসে—বেছে বেছে ঠিক সোমত্ত জোয়ান মেয়ে যে দঙ্গলে আছে সেই খানে।

নিধের আর তার দলবলের এ সব ব্যাপার জানা। কোথায় তারা ঘুপটি মেরে থাকে বলা যায় না। মাঝ-রাতে অমন ফিস্‌ফিসানি উঠলে কখনো তাদের গলা শোনা যায়—'কে গো, থাকো মাসি না?'

থাকো মাসি, থতমত খেয়ে প্রথমটা চুপ করে যায়, তার পর গাল পেড়ে বলে, "কেরে তুই মুখপোড়া ওলাউঠো !"

জবাব আসে, "তোমার বোনপো গো মাসি, চিনতে পারলে না। না চেনো ত তোমার লালমোহনকে গিয়ে শুধিও।"

"লালমোহনকে বলে তোদের মুখে নুড়ো জ্বালবার বন্দোবস্ত করছি গিয়ে।"

"তাই করো মাসি, আর ওই সঙ্গে লালমোহনকে গিয়ে বলো মালগুদামে আর দুটো দরোয়ান রাখতে! হামেশা এত লুট হলে আর সেখানে থাকবে কি? এই ত পরশু এই খবর-ই এনেছিলে না?"

চারিদিকে মেয়েদের মধ্যে যেন মৌচাকে ঢিল পড়ায় গুঞ্জন বাড়তে থাকে। গতিক সুবিধে নয় দেখে থাকো মাসি গজরাতে গজরাতে সরে পড়ে।

কিন্তু নিধের দল ত আর সারা রাত গোটা ষ্টেশনটা পাহারা দিয়ে বেড়াতে পারে না। অত গরজও তাদের নেই, নেহাৎ চোখ-কানের বাইরে না হলে একটু রগড় না করে পারে না এই যা। কিন্তু এসব শয়তানি লালমোহনের অজানা নয়। হাতে পেলে সে এখন তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে পারে। তার রাগ যে কতখানি ছকার বেলাই টের পাওয়া গেছে। ছকা ওরই মধ্যে ছিল একটু বোকাসোকা। দিন দুপুরে বাজারের মধ্যে সেদিন থাকো মাসিকে দেখে টিট্‌কিরি দিয়ে বলেছিল, "কি গো থাকো মাসি। দিনে আবার বাজার করছ কবে থেকে? তোমার ত রাতের বাজার—ইষ্টিশনে।" যারা জানে, তারা শুনে হেসেছিল। থাকো মাসি সুরু করেছিল গাল পাড়তে। ঠিক সেই সময়ে কাঁসাই নদীর বালি বোঝাই লরী নিয়ে আসছিল স্বয়ং লালমোহন। গোলমাল দেখে লরী থামাল। ধরা পড়ল ছকা। মালগুদামের অফিস-ঘরের পেছনে ক'খানা বেত তার পিঠের ওপর ভেঙেছে তার ঠিক নেই। তারপর চুরির দায়ে চালান হয়ে গেছে সদরে।

নিধে আর তার সাঙ্গপাঙ্গর ওপর লালমোহনের জাতক্রোধ কি সাধে! হাল ফেরার সঙ্গে ভোল বদলে ফেলে সবাইকে সব কিছু পুরোন কথা সে ভুলিয়ে দিয়েছে। বাজারে ষ্টেশনে লালমোহন এখন লালবাবু। শুধু এই হতভাগা ষ্টেশনের জঞ্জাল গুলো কিছু ভোলে না। এখনো তারা দূর থেকে টিট্‌কিরি দেয়, তার নামে ছড়া কাটে।

এরই মধ্যে একদিন শ্যামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হ্যাঁ, সেই শ্যামা আবার ফিরে এসেছে ষ্টেশনে। কিন্তু সে কাল-কেউটে গেল কোথায়! চিরকাল তার হাড়-সার চেহারা। কিন্তু সে হাড় ছিল যেন ধারালো ইস্পাতের; এখন যেন পোড়া পাকাটি, টুস্‌কি দিলে ভেঙ্গে যাবে। আগেকার যারা এখনও টিকে আছে, তারা নানান কথা শুধোয়—"কোথায় ছিলি এতদিন? গেছিলি কেন? কেন এমন হাল?" শ্যামা জবাব দেয় না। কে একজন বলে, 'লালমোহন নাকি তোকে ধরে নিয়ে গেছল?' শ্যামার চোখ দুটো দেখে এবার মনে হয় যে কাল সাপ এখনো একেবারে মরে যায়নি, সবে খোলস ছেড়ে এসে শুধু নেতিয়ে পড়েছে। কিন্তু নেতিয়ে একেবারে যেন ভেঙে পড়েছে। মড়ার মত ফ্যাকাশে চেহারা, নড়ে বসতে যেন জোর নেই, থেকে থেকে কি বিশ্রী ভাবে যে বুক চেপে ধরে কাসে। কে যেন বলে, শ্যামার বাচ্চা হবে। লুকিয়ে তাই নিয়ে সবাই হাসাহাসিও করে। নিধে তার মধ্যে থাকে না। শ্যামার বাচ্চা হবে ভাবতেই তার কেমন বিশ্রী লাগে। নিজেদের বয়সের হিসেব তাদের নেই। শরীরের বাড়ের মত বয়সও তাদের যেন কোথায় এসে থেমে গিয়েছে। কিন্তু শ্যামা যে তার চেয়ে বেশী বড় নয় সে জানে। শ্যামাকে একদিন সে হিংসে করেছে, তার সঙ্গে রেষারেষি করেছে, তাকে নিজেদের একজন ভেবে।

বাচ্চা বইবার শাস্তি ভোগ করবার মত, শ্যামা যে হঠাৎ একটা আলাদা

জাতের হয়ে যেতে পারে এ তার ধারণারই যেন বাইরে। হওয়ায়-ওড়া তার হাল্কা মন কোথাকার একটা কালো মেঘের চাপে ভারী হয়ে ওঠে তাই। সে মেঘের ভেতর থেকে একটা চাপা বিদ্রোহও থেকে থেকে গুম্‌রে ওঠে—ঠিক কার বিরুদ্ধে সে বোঝে না। বুঝতে গেলে শুধু লালমোহনের ঠোঁটবাঁকান মুখটাই চোখের ওপর ভাসতে থাকে।

তুনম্বর সাইডিংএর কারখানা-ঘরের পেছনে রাতের বেলা শ্যামা কোথায় এসে শোয় নিধে জানে। ষ্টেশনে আজ কাল আলো নেই বল্লেই হয়। অন্ধকারে কালো করোগেটের দেয়ালের গায়ে শ্যামা যেন একেবারে মিশে থাকে। নিধে এসে তার পাশে বসে পড়ে; তার পর নেহাৎ যেন তাচ্ছিল্য ভরে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ছিলি দিনভর? জোটেনি বোধ হয় কিছু?'

শ্যামা উত্তর দেয় না, তার কাসির ধমক উঠেছে বলেই বোধ হয়। আজকাল সে সত্যিই বেশী দূর ঘুরে ফিরে ভিক্ষে করতেও পারে না।

নিধে একটা কাগজের মোড়া খুলে কি ত'একটা মুখে ফেলে চিবোয়, তারপর কাগজটা শ্যামার দিকে এগিয়ে দিয়ে, অত্যন্ত আমিরী চালে বলে, 'ভাল লাগে না আর ছাই পাঁশ চিবোতে, নে, খাবি'ত খা!'

শ্যামা তবু হাত না বাড়িয়ে চুপ করে বসে বসে কাসির ধমক সামলে হাঁপায়। নিধে খেঁকিয়ে ওঠে, "বড় যে নবাবজাদি হয়েছিস্‌ দেখছি। দিচ্ছি ত নেওয়াই হচ্ছে না। না নিসত মর উপোষ করে। আমার কি!"

অন্ধকারেও শ্যামার চোখ এবার যেন জ্বলে ওঠে, গলাটাও সেইসঙ্গে—"মরব না, মরব না—তুষমনের চিতের আগুন না দেখে নয়।"

নিধে গুম্‌ হয়ে বসে থাকে। তার মনের সেই কালো মেঘ থেকেও একটা জ্বালাময় আগুন যেন ঠিক্‌রে বেরোয়!

শ্যামা এবার কাগজটা তুলে নিয়ে তা থেকে তু'-একটা টুকরো চিবোয়।

কি-বা তাতে আছে—ছুটো কুটনোর খোলা, রুটির শক্ত টুকরো, মাংসের হাড়, ডিমের খোলা। বুঝি কোন চলতি ট্রেণের হেঁসেলের জঞ্জাল ববুর্চিরা যেতে যেতে ফেলে দিয়েছে কাগজে মুড়ে। অমন পঞ্চাশটা মানুষ আর কুকুরের কাড়াকাড়ির ভেতর থেকে তাই ছোঁ মেরে নিয়ে আসতে হয়েছে নিধেকে। ছাই-পাঁশ চিবোতে তার ভাল লাগে না বলেই বোধ হয় এত রাত পর্য্যন্ত কাগজের মোড়াটা সে সাবধানে আগলে নিয়ে ফিরেছে।

ট্রেণের হেঁসেলের জঞ্জালও সব দিন জোটে না। ছু'দিন ধরে ইঁছুরের মত সেয়ানা নিধেকেও হায়রাণ হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে খিদের জ্বালায়। ষ্টেশন ছেড়ে বাজার পর্য্যন্ত সে হানা দিয়েছে। খাবারের দোকানের ফেলে-দেওয়া পাতাগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে চেটেছে, ছু-চার টুকরো পচা তরী-তরকারী, মাছ কেউ কোথাও ফেলেছে কিনা খুঁজে ফিরেছে। কিছুই তবু জোটেনি।

ষ্টেশনে এরি মধ্যে লালমোহনের হাতে ধরা সেদিন পড়ে গিয়েছিল আর কি। লালমোহন কি কাজে এসেছিল ষ্টেশনে। ওভার ব্রীজ দিয়ে নামবার পথে একেবারে মুখোমুখি বল্লেই হয়। কোন রকমে লাফ দিয়ে পালিয়ে নিধে প্ল্যাটফর্মের নীচে গিয়ে ঘুপটি মেরে লুকিয়েছে। লালমোহন তাকে দেখতে পায়নি! কিন্তু শ্যামাকে সে দেখেছে। শ্যামার তাড়াতাড়ি হাঁটবার ক্ষমতা নেই, তবু সে লালমোহনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ওভারব্রীজের তলায় লোহার থামগুলোর সঙ্গে নিজেকে যেন মিশিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু লালমোহন নিজে থেকেই গেছে এগিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে,—"আরে কে, শ্যামা না? বাঃ বাঃ চেহারার যে খুব খোলতাই হয়েছে দেখছি! ভাগ্যিস রাতেরবেলা দেখিনি, নইলে ভিমি যেতাম।"

নতুন একটা ভিখিরী মেয়ে বলেছে, "কি করবে বাবু, খেতে না পেয়ে এমন দশা।"

"খেতে না পেয়ে! পেট ত খালি বলে মনে হচ্ছে না।" বলে নিজের রসিকতায় গলা ছেড়ে হেসে লালমোহন ভিখিরী মেয়েটাকে দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেছে। নিধের মনে হয়েছে তার মাথার ভেতরকার সেই কালো মেঘটা তার চোখের ওপর নেমে যেন সব ঝাপসা করে দিলে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে।

তার পরের দিনই বিকেলের দিকে সেই মিলিটারি ট্রেণটা এসেছিল। বেশীক্ষণ নয়, ঘণ্টা তিনেক বুঝি দাঁড়িয়েছিল ষ্টেশনে। আর সকলের সঙ্গে নিধেও গিয়েছিল যা পারে গোরা পল্টনদের কাছে বাগাতে। কিন্তু ট্রেণ ছাড়বার অনেক আগেই তার আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। সবাই একটু অবাক্ হয়েছে বই কি! পল্টনদের সঙ্গে আলাপ জমাতে নিধেই সবার সেরা; সেই সব চেয়ে তুখোড়, ইংরেজি ফড় ফড় করে বলতে। ট্রেণ ছাড়বার আগে সরে পড়বার বান্দা সে ত নয়। লালমোহন সেদিক পানে এলেও না হয় ব্যাপারটা বোঝা যেত। লালমোহন গোরাপল্টনের গাড়ি এলে এখনো মাঝে মাঝে এসে হাজির হয়। সাহেব-সুবোর গা ঘেঁসে তোয়াজ করবার সখ এখনো তার আছে। কিন্তু লালমোহন সেদিন এদিক মাড়ায়নি।

তবু নিধে এ তল্লাটে আর ছিল না। ট্রেণ ছাড়বার পর নিঃশব্দে সে পয়েণ্টসম্যানের কেবিনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, তার পর আবার অন্ধকারে মিশে গেছে।

অনেক রাত্রে দু-নম্বর সাইডিং-এর কারখানা ঘরের পাশে শ্যামা তার দেখা পেল। ছায়ার মত নিঃশব্দে নিধে এসে পাশে বসবার পর শ্যামাই নিজে থেকে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'এনেছিস্ কিছু?'

'এনেছি।' নিধের গলার স্বরটা যেন কেমন।

শ্যামা আগ্রহভরে বল্লে, "কই দেখি!" নিজে থেকে এমন করে শ্যামা কখনও খেতে চায় না। কিন্তু দু-দিন ডাহা উপোসের পর পাথরেও চিড় ধরে।

নিধের তাই বুঝি বলতে গলাটা ধরে গেল, "খাবার পাইনি কিছু।"

শ্যামা একেবারে গুম্ হয়ে গেল এবার। নিধে খানিক চুপ করে থেকে প্রায় যেন চুপি চুপি বল্লে, "আজ রাত্রে যাবি, থাক মাসিব সঙ্গে লালমোহনের মাল-গুদোমে?"

"আমি যাব!" শ্যামার চোখ দুটো জ্বলে উঠল অন্ধকারে, নিধের মনে হ'ল এখুনি যেন সে বাঘিনীর মত হিংস্র ভাবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ধীরে ধীরে সে আবার তাই বল্লে, "আজই যাবার দিন। এই নে।"

কি একটা জিনিষ অন্ধকারে শ্যামার দিকে সে বাড়িয়ে দিলে। তাতে হাত দিয়েই শ্যামা চমকে উঠল—ঠাণ্ডা শক্ত একটা কি। অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'কি এটা?'

নিধে বুঝিয়ে দিয়ে বল্লে, "আঁচলে বেঁধে নে!"

অনেক রাত পর্য্যন্ত অন্ধকারে ষ্টেশনের এধারে-ওধারে ঘুরে বেড়িয়ে তার পর নিধে লালমোহনের গুদোমের দিকে পা বাড়াল। এতক্ষণে সময় হয়েছে নিশ্চয়। কি যে এর মধ্যে হয়, তা সে ভালো করেই জানে। থাকো মাসি আট ঘাট বুঝে এসে চুপি চুপি কথাটা যথাস্থানে রটায়। খিদের জ্বালায় উন্মত্ত ছোট খাট একটি দল লোভ সামলাতে না পেরে তার পেছু নেয়। আসল জায়গাটার হদিস দিয়ে থাকো মাসি তার পর সরে পড়ে। কারুর তখন আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নেই। থাকো মাসির কথা একেবারে মিথ্যে নয়। গুদোমের পেছন দিকে সত্যি একটা ছোট

দরজা খোলা। সেখান দিয়ে চালও কারা বার করে আনছে দেখা যায়। তারা গিয়ে সেখানে জড় হয়। সাহস করে ভেতরে যায় এক এক করে। চাল একটু-আধটু সরাতে শুরু করেছে এমন সময় কোথা থেকে হৈ চৈ করে ছুটে আসে পাহারাদারেরা। একটু আধটু মার ধর খেয়ে যারা ছাড়া পায়, তারা ভাবে খুব বাঁচা বাঁচলাম। কিন্তু ধরে যাদের রাখবার তারা ঠিক ধরা পড়ে। চোরের মার খেয়ে সবাই নিঃশব্দে হজম করে। চোরের নালিশ মুখ ফুটে কেউ জানাতে পারে না।

৩ নং সাইডিং-এর পর ঢালু রেলের লাইনের পাড়টা দিয়ে নেমে গেলে শাল-বন পড়ে সামনে। সেই শালবনের ভেতর দিয়ে খানিকটা গেলেই ফতেচাঁদ সিঙ্ঘির গুদোম। ফতেচাঁদ আজকাল এ অঞ্চলে থাকে না। আর কোন বড় কাজ নিয়ে চলে গেছে কোথায়। লালমোহনই এখানে সর্বেসর্বা।

শালবনের ভেতর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নিধে চুপ করে দাঁড়ায়। নিস্তব্ধ থমথমে রাত, আকাশে চাঁদ নেই। দূরে কোথায় একটা সান্টিং করা ইঞ্জিন যেন হাঁপাচ্ছে। কোথায় ক'টা কুকুর দু' চার বার ডেকে থেমে গেল। শালবনের মাথায় তারাগুলো যেন তারই মত কি একটা শোনবার অপেক্ষায় অধীর হয়ে কাঁপছে।

কি সে শুনতে চায়? কিছু নয়, শুধু হঠাৎ একটা শব্দ, হয়ত তারই সঙ্গে একটা চীৎকার। কিন্তু রাতের স্তব্ধতা অমন করে অকস্মাৎ ভাঙ্গে না। একটা হাল্কা হাওয়ায় কটা পাতা খস্ খস্ করে উড়ে যায়। রাত চরা একটা পাখী ডেকে ওঠে।

অনেকক্ষণ নিধে তবু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, মশারা তার সন্ধান পেয়ে ঘিরে ধরে গুণ্ গুণ্ করে। এদিক্ ওদিক্ সে পায়চারী করে খানিক, কিন্তু রাত তবু তেমনি স্তব্ধ। শুধু ষ্টেশনে গাড়ির সঙ্গে গাড়ি

জোড়ার শব্দ আসে মাঝে মাঝে :—একটানা একটা মালগাড়ির চলে যাওয়ার ঘর্ঘর শোনা যায় খানিকক্ষণ। একটা ইঞ্জিন হুইশল দিয়ে ওঠে। আর কিছু নয়।

ঘুমে যখন চোখ একেবারে জড়িয়ে আসে তখন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিধে ভোরের দিকে আবার ষ্টেশনে ফিরে যায়।

সকালবেলা ঘুম যখন ভাঙে তখন বেশ বেলা। ভোরের অন্ধকারে পাখীর কলরব-ভরা গানে মেঘের মত আবছা গাছগুলো আজ সে দেখতে পায়নি। উঠে শুনল, বাজারে কি একটা কাণ্ড ঘটেছে। অনেকে ছুটছে সেদিকে। তাকেও যেতে হল।

রীতিমত ভিড় জমে গেছে এক জায়গায়। একটা মেয়ে ধূলোর ওপর পড়ে আছে লুটিয়ে,—অজ্ঞান হয়েছে না মারা গেছে বলা যায় না। হাত-পাগুলো যেন যন্ত্রণায় বেঁকে গিয়েছে। নানান জনে নানান কথা বলে। বলে, খুনখারাপি নয়, মরেছে মোক্ষম রোগে, নাম যার কিনা পেটের জ্বালা। কেউ জিজ্ঞেস করে, কে হে মেয়েটা?

মেয়েটা শ্যামা নয়। ভিড় থেকে বেরিয়ে ষ্টেশনের দিকে খানিকটা এগুতেই শ্যামার সঙ্গে দেখা হয়। রাস্তার ধারে বসে পড়ে বুক চেপে ধরে কাসছে। নিধে তার কাছে ছুটে যায়। যা বলতে চায় তা কিন্তু বলতে পারে না। শ্যামা কাসতে কাসতে করুণভাবে তার মুখের দিকে তাকায়। তার আঁচলের দুধারে দুটো পুঁটুলি বাঁধা। একদিকে খানিকটা চাল আর একদিকে নিধের দেওয়া সেই পিস্তল!

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

শনি ও মঙ্গলের, মঙ্গলই হবে বোধ হয়, যোগাযোগ হ'লে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্ম্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু'দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়—আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোন এক আশ্চর্য সরোবরে—পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিষে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধূলোয় চট্‌চটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেবে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নীচু একটা জলার মত জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চলে গেছে। তারি ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘনজঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোন দিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখীরাও যেন সভয়ে সে জায়গা পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে। একটা স্যাঁৎসেতে ভিজে ভাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নীচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড় রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদাজলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে নালার মত রেখাও

কিছু দূরে গিয়ে হু'ধারে বাঁশ ঝাড় আর বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দু'জন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়ত আপনার মত ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ অভিযানে তারা এসেছে,—কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে।

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন। মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐক্যতান আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড় রাস্তায় উঠে ফিরতি কোন বাসের চেষ্টা করবেন কি না যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদা জলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গরুগুলি—মনে হবে পাতালের কোন বামনের দেশ থেকে গরুর গাড়ির এই ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সেই গরুর গাড়ীর ছই-এর ভেতর তিনজনে কোন রকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্ব্বাধিক বস্তু কি ভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গরুর গাড়িটি তারপর যে পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে সুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সঙ্কীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মত পথ সামনে একটু একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্য্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সঙ্ঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্ঝনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্ব্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে,—এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।

ব্যাপারটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানাস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা কম্পিত কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত না হ'লে এই ক্যানাস্তারানিনাদই তাকে তফাৎ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্র-সঙ্কুল এরকম স্থানের

অস্তিত্ব কি করে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দু'পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সে সব ধ্বংসাবশেষ,—কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে;—যাদুঘরের নানা প্রাণীদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু'তিনবার মোড় ঘুরে গরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত পাগুলো নানাস্থান থেকে কোন রকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা পচা গন্ধ। অর্দ্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙ্গা ছাদ, ধ্বসে পড়া দেওয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মত পাল্লাহীন জান্‌লা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মত দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙ্গা

লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহুযুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধূলো হয়ত কেউ আগে কখন পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেওয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মত থেকে থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু'তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দু'টি বন্ধুর একজন পান-রসিক ও অপরজনের নিদ্রা-বিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের ওপর কোনরকমে সতরঞ্চির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকা ধ্বনি করতে সুরু করবেন, অপরজন পান-পাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনি ক্রমশঃ গাঢ়ভাবে কালিমা-লিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোন রহস্যময় বেতার-সঙ্কেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হ'লে দেওয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুলীন,—ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খসে পড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ

আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোন দুর্ব্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে এই মৃত্যু-সুষুপ্তি মগ্ন মায়াপুরীর কোন গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্ত্তে অদূরে সঙ্কীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনি হয়তো দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্ত্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্ত্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে ছায়া সরে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদ্বুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না!

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখীর কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। এক সময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য আরাধনার জন্যে শ্যাওলা ঢাকা ভাঙ্গা

ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়ি পানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখী ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শীকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্ব্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোন ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাংলা কাঁচের মত পাখা নেড়ে আপনার ফাংনাটার ওপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাংনা মৃদুমন্দ ভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাংনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্ম্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, “বসে আছেন কেন? টান দিন।”

সে কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুণ বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে ওঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুত ভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্ত্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জ্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়ত দেখবেন আপনার মৎস্যশীকার নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা করে হয়ত আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন,—"কে আবার বলবে! এই মাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়ত জানতে পারবেন যে, পুকুর ঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না

মেয়েটি আপনার পান রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মত তাদের ওখানেই হয়েছে।

যে ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্ত্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংস মূর্ত্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেন নি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ী জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়ত আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়ত যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছে থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য্য আরো বেশী করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন! একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু'চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপর তলার কোন ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হয়ে উঠেছে মনে হবে—সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্ততঃ করে সে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, "একটু এখানে শুনে যাও মণিদা।"

মণিদা আপনার সেই পান-রসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতর স্বরে বিপন্নভাবে বলছে, "মা'ত কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কি বলব।"

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, "ওঃ সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ, কেবলই বলছেন,—'সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!' কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য্য বেড়েছে যে, কোন কথা বুঝোলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে তখন ওঁর প্রাণ বাঁচান দায় হয়ে ওঠে!"

"হুঁ, এ'ত বড় মুস্কিল দেখছি। চোখ থাকলেও না হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।"

ওপর থেকে দুর্ব্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, "তুমি একবারটি চল মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পার।"

"আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।"—মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, "এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত পা পড়ে গেছে, চোখ নেই তবু বুড়ি পণ করে বসে আছে কিছুতেই মরবে না।"

ব্যাপারটা কি এবার আপনারা হয়ত জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, "ব্যাপার আর কি! নিরঞ্জন বলে ওঁর দূর সম্পর্কের এক

বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে ছোকরা এসে ওঁকে বলে গেছল বিদেশের চাকরী থেকে ফিরে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুণছে।"

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, "নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরে নি?"

"আরে সে বিদেশে গেছল কবে যে ফিরবে! নেহাৎ বুড়ি নাছোড়বান্দা বলে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছল। এমন ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে কথা ওঁকে বলে কে? বল্লে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হ'লে এখুনি ত দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?"

"যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?"

"তা আর জানে না! কিন্তু মার কাছে বলবার উপায় ত নেই। যাই, কর্ম্মভোগ সেরে আসি!" ব'লে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়ত উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়ত বলে ফেলবেন, "চল, আমিও যাব।"

"তুমি যাবে!" মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

"হ্যাঁ, কোন আপত্তি আছে গেলে?"

"না, আপত্তি কিসের!" বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সঙ্কীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে ঘরটিতে আপনি পৌঁছোবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে

সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোষে ছিন্ন কন্থা জড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোষের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে: "কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল, বাবা তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার ত আর অমন করে পালাবি না?"

মণি কি যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, "না মাসিমা, আর পালাব না।"

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মত মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির বিন্দুর মত ঝরে পড়ছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, "আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাইত এমন করে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুণেছি।"

বৃদ্ধা এতগুলি কথা বলে হাঁফাবেন; চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোসের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে—ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরী এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আল্‌গা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরী নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, "যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার

পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই—তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ—দশটা বাড়ী খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মত ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইঁট আঁকড়ে এখানে সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কিনা করছে!"

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, "যামিনীকে তুই নিবি ত বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।"

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।

তারপর বিকালে আবার গরুর গাড়ী দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্ত্তে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে,—"আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!"

আপনি হেসে বললেন, "থাক্ না। এবারে পারিনি বলে, তেলেনা-পোতার মাছ কি বার বার ফাঁকি দিতে পারবে!"

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মত আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ী চলবে। কবে একশ না দেড়শ বছর আগে প্রথম ম্যালেরিয়ায় মড়কের এক দুর্ব্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার

বন্ধুরা হয়ত সেই আলোচনা করবেন। সে সব কথা ভালো করে আপনার কাণে যাবে না। গাড়ীর সঙ্কীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃদস্পন্দনে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন,—"ফিরে আসব, ফিরে আসব।"

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌছোবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অতিরঙ্গ একটি তারার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটখাট বাধা বিড়ম্বিত কটি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াসা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ, তোষক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হ'বে। থার্মো-মিটারের পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রী, ডাক্তার এসে বলবে, "ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?" আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। অস্ত যাওয়া তারার মত তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরির ছায়ার মত সেই মেয়েটি হয়ত আপনার কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের অবাস্তব কুয়াসাময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

বুধন চৌকিদারের হাঁক আজকাল আর শোনা যায় না। সে এক রকম ছুটি পেয়েছে। গাঁয়ে কদিন ধরে একটা রাত-পাহারার দল তৈরী হয়েছে। সারারাত পালা করে তারা সমস্ত গাঁ টহল দিয়ে বেড়ায়। আর মাঝে মাঝে যা হাঁক ছাড়ে তাতে চোর ডাকাতের চেয়ে গৃহস্থের রক্তই আগে শুকিয়ে যাবার কথা।

দলটি বেশ ভারী। কদিন আগে হারাণ বুড়োর গঙ্গাযাত্রার খাট বইবার জন্যে যেখানে চারটে জোয়ান ছেলে বোয়ানবাদি থেকে বীরগঞ্জ পর্য্যন্ত খুঁজে বার করতে হায়রান হতে হয়েছে সেখানে ছেলের দল আজকাল পিল পিল করছে ঘরে ঘরে।

কলকাতায় বোমার ভয়েই বুঝি গাঁয়ের এমন বরাত খুলেছে হঠাৎ। ভিটেতে তিনপুরুষ যাদের সন্ধ্যা পড়েনি এতদিন, তাদেরও পোড়ো বাড়ীতে হঠাৎ জনমজুর লেগে গেছে বাড়ী মেরামত করতে। হেঁজি পেঁজি থেকে হোমরা চোমরা গাঁয়ে যার এতটুকু আস্তানা আছে কেউ আর আসতে বাকি নেই।

সামন্তদের ভূতুড়ে ভিটেটাতেও দেখা যায় রাত্রে আলো জ্বলে। সামনের জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে তুটো নতুন ঘরের চালাও এরই মধ্যে তোলা হয়ে গেছে।

ছেলের দলের অনেকেরই গাঁয়ের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ। তবু কাণা ঘুষায় তারা ইতিমধ্যে অনেক কথা হয়ত শুনেছে। মজুমদার বাড়ির রবি একটু বেশী জোরেই সবার আগে হঠাৎ তাদের মার্কামারা পিলে চমকান ডাক ছাড়ে এ—হো!—হারা—রা—রা—রা—রা—রা!

সবাইকে সমস্বরে যোগ দিতে হয়। হাঁক শেষ হ'লে বিভূতি হেসে বলে,—রবিটা ভয় পেয়েছে—বুঝেছিস্।

ভয়!—বাঃ ভয় পাব আমি!—রবি প্রতিবাদ জানায়! ভয়টা আমার

কিসের শুনি! আমি ত তোদের মত সহুরে সভ্য নই যে কেঁচো দেখে কেউটে ভাবব! গাঁয়ের ছেলের গাঁয়ে আবার ভয় কিসের!

বিভূতি হেসে বলে,—গাঁয়ের ছেলে বলেইত গাঁয়ে বেশী ভয়! সহুরে ছেলে কেঁচো কেউটে কিছুই চেনে না, আর তোরা যে গাঁয়ের আনাচে কানাচে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে সব ভূত পেরেত জুজু বসিয়ে রেখেছিস্! সামন্তদের এই পোড়ো ভিটেটায় ত তোদের কোন শাঁকচুন্নীর বাস না?

তর্কটা আরও কিছুদূর হয়ত চলত কিন্তু অমল হঠাৎ চাপাগলায় বলে,—আলো নিয়ে কে বেরুচ্ছে যে বাড়ি থেকে!

সকলেরই গলা বন্ধ হয়ে যায়। পোড়ো ভিটের ভেতর থেকে আলো হাতে সত্যিই কে বেরিয়ে আসছে।

রবি তাড়াতাড়ি বলে,—চ ভাই চ এগিয়ে যাই।

কেন ভয় কিসের!—বিভূতি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

রবি ভয়ের অপবাদে একটু রেগে উঠেই বলে,—আহা ভয়ের জন্যে কি যেতে বলছি। কিন্তু রাত দুপুরে গোলমাল করে লাভ কি। বুড়ো শুনেছি বড় বেয়াড়া লোক।

আমরাও বেয়াড়া ছেলে। আর খেয়ে ত ফেলবে না।—বিভূতি যেন গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

রবি শুধু নয়—এ ব্যাপারে রুখে দাঁড়ানটা দেখা যায় অনেকেরই পছন্দ নয়। অমল বলে,—না—না, দোষ ত আমাদের। রাতদুপুরে ডাকাতপড়া চিৎকার করে তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ কি! বুড়োর আবার মাথায় নাকি ছিট্ আছে।

ভুবন বারুই এতক্ষণ বাবুদের কথায় মাথা গলায় নি। এবার সায় দিয়ে বলে,—আজ্ঞে হাঁ বাবু, দুদিন চাল ছাইতে গিয়েই আমি টের পেয়েছি।

যেমন বুড়ো তেমনি মেয়েটা—কি যেন এক রকম বাবু। আর সহজ মানুষ হলে কি ওই অজগর পুরীতে কেউ ডেরা বাঁধে। অপদেবতার ভয় না থাক সাপখোপের ভয়ও কি নেই।

বিভূতির ভাব দেখে মনে হল এসব কোন কথাতেই তাকে বুঝি টলান যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা আপনা থেকেই আর এগোয় না। পোড়ো ভিটের আলোটা খানিক এগিয়েই এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে। দূর থেকে সে অস্পষ্ট আলোয় বিশেষ কিছু দেখা যায় না। খানিকবাদে আলোটা আবার দেখা যায় ভেতরের দিকে সরে যাচ্ছে।

বিভূতি এবার একটা অবজ্ঞা মেশান জয়ের হাসি হেসে বলে,—বেয়াড়া লোক শুনে ভয় পাবার ছেলে বিভূতি ঘোষ নয়। এমন ঢের বেয়াড়া আমরা সিধে করেছি।

সবাই আবার সামনের দিকে এগোয়। বিভূতির বাহাদুরীতে খুসী বোধ হয় মনে মনে কেউ হয়নি। বিভূতি যেন অত্যন্ত অন্যায় ভাবে সকলের উপর একটা টেক্কা দিয়ে ফেলেছে। তার সব বিষয়ে টেক্কা দেওয়ার ধরণটাই কারুর ভাল লাগে না।

গাজনতলা পার না হওয়া পর্যন্ত আর কারুর হাঁক দেওয়ার কথা মনে থাকে না। হাঁকটাও এবার কেমন যেন ঝাঁঝালো নয়। রাত প্রায় দুটো বাজে। প্রথম দলের পাহারার পালা এবার শেষ। ভদ্রেশ্বরীর মন্দির বাঁয়ে রেখে এবার সবাই চৌধুরী বাড়ীর পথ ধরে। সেখানে চৌধুরীদের নাটমঞ্চে শেষ রাতের পাহারার দল অপেক্ষা করে আছে।

সবাইকার পা একটু জোরেই চলে এবার। অন্ধকার তিথির রাত-পাহারা তেমন যেন জমে না। শুধু অমল একটু পিছিয়ে পড়ে বুঝি ইচ্ছে করেই।

অমল স্পষ্টই দল-ছাড়া। রাত-পাহারার দলে সে নাম লিখিয়েছে

কিন্তু আর সবাইকার মত শুধু হুজুগে পড়ে বা চৌধুরীদের কথা ঠেলতে না পেরে নয়। চৌধুরী বাড়ি থেকে পাহারার দলের জন্যে রোজ সন্ধ্যায় যে চা জলখাবার আসে তার লোভও আর যার থাক তার অন্ততঃ নেই। রাত-পাহারায় সমস্ত নির্জ্জন গ্রাম টহল দিয়ে বেড়াতেই তার বড় ভালো লাগে।

গাজনতলা পার হয়ে ভদ্রেশ্বরী মন্দিরের কাছে এলেই তার মনটা কেমন যেন করে ওঠে। প্রথম রাত-পাহারার বেলাই তার এমন হয়েছিল, এতদিনেও কিন্তু সে অনুভূতিটা পুরানো হল না। এখনও সমস্ত দেহে কিরকম যেন একটা নেশা লাগতে থাকে,—একটা অদ্ভুত আনন্দ।

কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী না নবমী। বাঁয়ে শীতলবাঁধের তাল গাছগুলোর ফাঁকে আকাশে নিভু-নিভু আগুনের মত একটা মরা লালচে রঙের ছোপ দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদেই মাঝ রাতের ক্ষয়ে-যাওয়া চাঁদ দেখা দেবে। এই মরা লালচে আলোর কেমন একটা থমথমে ভাব আছে কেমন যেন আতঙ্কের আভাষ। ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরের সবটাই অন্ধকারে অস্পষ্ট; শুধু তে-ফলা পেতলের চূড়োটা কি একটা ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত নিয়ে যেন আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে।

ভদ্রেশ্বরী আজকাল অত্যন্ত ভদ্র সভ্য দেবী। চৌধুরীরা অনেককাল তাঁর সেবা করে আসছে। তারা চার পুরুষ ধরে বৈষ্ণব। ভদ্রেশ্বরীর তাই শশা কুমড়োর বেশী আর আজকাল কিছুতে লোভ নেই। কিন্তু একদিন ছিল যখন এ মন্দিরের চত্বর রক্তে ভেসে গেছে। নর-রক্তও নাকি বাদ যায়নি। কিন্তু সেও বুঝি সেদিনের কথা। দেবী মূর্ত্তিকে অন্ধকার গর্ভগৃহে দেখবার সৌভাগ্য একদিন অমলের ইতিমধ্যে হয়েছে। অমল খুব বেশী কিছু জানে না কিন্তু মূর্ত্তিটি যে চিরদিন এমন রক্তলোভাতুরা ছিলেন না এটুকু বুঝতে তার দেরী লাগেনি। তারা না মৈত্রেয়ী, না শীলভদ্রা

বৌদ্ধ যুগে কি তাঁর নাম ছিল কে জানে। সে নাম কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তারপর কবে কেমন করে পরিচয় ও প্রকৃতি দুইই তাঁর নূতন ভক্তের হাতে বদলে গেছে কেউ জানে না। সে কতকালের কথা অমল ভাবতেও পারে না। তবু গভীর শীতের রাত্রে এই নির্জ্জন পথ দিয়ে যেতে তার শরীরে কেমন যেন একটা শিহরণ লাগে। সেই সুদূর অতীত তার সমস্ত বর্ণ-সমারোহ নিয়ে যেন এই অন্ধকারের তলাতেই জেগে আছে। একটু ঘষে নিলেই যেন ধূলো পড়া কাঁচের মত তার তলায় সে মূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কি ছিল তখন এই গ্রামের রূপ। ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরের পাশে ছায়া-করা এই প্রাচীন বট গাছ বুঝি শুধু সেদিনের সাক্ষী। শীতলবাঁধের পাশে ওই বিরাট মাটির ঢিবি হয়ত সেদিন ছিল আচার্য্য শ্রমণ ভিক্ষুদের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রে মুখর নির্জ্জন অরণ্য-বেষ্টিত সঙ্ঘারাম। প্রাচীন যুগের কত চিহ্ন কতজন ত সেখানে কুড়িয়ে পেয়েছে। এই নির্জ্জন সঙ্ঘারামে হয়ত কোন এক এমনি গভীর শীতের রাত্রি উজ্জ্বল মশালের আলোয় বিক্ষত হয়ে উঠেছে।···শোনা গেছে বহু পদাতিক অশ্ব ও হস্তীর পদধ্বনি ও কোলাহল। বহুদূর থেকে কোন প্রবল প্রতাপ সদ্ধর্ম-অনুরাগী রাজা এই অরণ্য-বেষ্টিত সঙ্ঘারামের মহাস্থবির প্রধান আচার্য্যের অসামান্য বিভূতির কথা শুনেছেন। গভীর রাত্রে তিনি এসেছেন সদলে আচার্য্যের কাছে তাঁর গোপন অভিপ্রায়-সিদ্ধির সহায়তা প্রার্থনা করতে। কে জানে এই সঙ্ঘারামেও তখন সদ্ধর্ম ব্যভিচারে বিকৃত হয়ে উঠেছে কিনা! কে জানে এই প্রাচীন বট কত অমানুষিক অনুষ্ঠানের স্মৃতি তার গোপন মর্ম্ম-কোষে সঞ্চিত করে রেখেছে! কিম্বা হয়ত এ সঙ্ঘারাম সত্যই তখনো তথাগতের অমৃতবাণী বিস্মৃত হয়নি। সামান্য ঐহিক ইষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে এসে সৌম্য শান্ত করুণার্দ্রনয়ন মহাস্থবিরের কাছ থেকে রাজা হয়ত শাশ্বত জীবনের

শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নিয়ে ফিরে গেছেন। শান্ত নির্জ্জন সঙ্ঘারামের চারিধার থেকে রাজ সমারোহ শীতের কুয়াশার মত মিলিয়ে গেছে……

আবার পড়েছে কালের যবনিকা। দীর্ঘ কাল সে যবনিকা আর ওঠেনি। সঙ্ঘারাম তখনই বুঝি ওই মাটির ঢিবিতে পরিণত। এখানকার অরণ্যে শুধু হিংস্র শ্বাপদ ঘুরে বেড়ায়। তারপর একদিন ভদ্রেশ্বরীর কেমন করে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে সম্বন্ধে অস্পষ্ট কিম্বদন্তী ছাড়া আর কিছুই জানবার উপায় নেই। সে কিম্বদন্তী আর সমস্ত কিম্বদন্তীর মতই সত্যে মিথ্যায় আজগুবি কল্পনায় মেশান। কোন দূর দেশের উগ্র উদ্ধত এক সৈনিক নিজের ভাইকে হত্যা করে রাজার কোপ থেকে পালিয়ে এই অরণ্যে বুঝি আশ্রয় নিয়েছিল। দীর্ঘ অবিরাম পর্য্যটনে ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে ক্ষুধায় পিপাসায় সে তখন মুমূর্ষু। হঠাৎ সে দেখতে পায় পরমাসুন্দরী এক মেয়ে তার কাছে বসে তার মুখে অমৃত ধারার মত মধুর জল ঢেলে দিচ্ছে। এই অরণ্যে সেই মেয়েটির সেবায় পরিচর্য্যায় সে ক্রমে সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। এই সেবার প্রতিদানে জোর করে সে মেয়েটিকে সঙ্গে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটির কোন অনুনয় মিনতি সে শুনতে চায় না। তখন মেয়েটি হঠাৎ অমানুষিক শক্তিতে তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে বজ্রস্বরে জানায় যে—ভাইএর রক্ত যে হাতে এখনও লেগে আছে সে-হাত তাকে স্পর্শ করবার যোগ্য নয়। ক্রোধে কামনায় অন্ধ হয়ে সৈনিক তারপরও তাকে ধরবার চেষ্টা করে। তখন মেয়েটি ওই প্রাচীন বটের তলায় এক পাথরের মূর্ত্তিতে পরিণত হয়ে তাকে জানিয়ে যায় যে ভ্রাতৃহত্যার পাতক রক্তে না ধুয়ে ফেলা পর্য্যন্ত তার মার্জ্জনা নেই। সেই পাথরের মূর্ত্তিই ভদ্রেশ্বরী দেবী, আর সেই সৈনিকই সামনবেড়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা রাঘব সামন্ত। রাঘব সামন্তই এদিকের সমস্ত অরণ্যভূমি জয় করে সেখানে বিস্তীর্ণ জনপদের পত্তন করে। দেবীর নির্দ্দেশ সে নাকি

অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ভদ্রেশ্বরী মন্দিরের পথ প্রতিদিন অসংখ্য বলির রক্তে পিচ্ছিল না করা পর্য্যন্ত তার তৃপ্তি হত না। দেবীর অনুগ্রহেই বোধ হয় তার সৌভাগ্যসূর্য্য দেখতে দেখতে চরম শিখরে উঠেছে। সামনবেড়ের পরিধি তখন এই গ্রামটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। রাঘব সামন্তর কাছে মাথা নীচু করেনি এমন কোন লোক এ অঞ্চলে ছিল না।

রাঘব সামন্ত সম্বন্ধে আর কিছুই শোনা যায় না। কিন্তু সামন্তদের উত্থান ও পতনের ইতিহাস কিম্বদন্তী আকারে এখনো অনেকের মনে আছে। সামন্তদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দিন দিন তারপর বেড়েই গেছে। নামে রাজা না হলেও তারাই ছিল এ অঞ্চলের একচ্ছত্র অধীশ্বর। সামন্তদের সৌভাগ্যের সঙ্গে ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরেরও উন্নতি হয়েছে। সে মন্দির বিরাট ও নতুন করে যিনি তৈরী করিয়ে তাতে সোণার চূড়া দিয়ে-ছিলেন বলে প্রবাদ, সেই উদয়রাম সামন্তর পর থেকেই কিন্তু সামন্তদের পতনের সূত্রপাত। লোকে বলে উদয়রামের একমাত্র ছেলে নরহরি সামন্ত নাকি বংশের অযোগ্য নেহাৎ অকর্ম্মণ্য ভালো মানুষ ছিলেন। না ছিল তাঁর মধ্যে সামন্তদের তেজ-বীর্য্য না তাদের বিষয়বুদ্ধি। চৌধুরীরা তখন থেকেই সামনবেড়ে একটু একটু করে শিকড় চালাতে সুরু করেছে। নরহরি বিষয় কর্ম্ম দেখেন না। দেখলেও বোঝেন কি না সন্দেহ। সামন্তদের বিরাট প্রাসাদ তাঁর সময় থেকেই ধ্বংস হতে সুরু হয়েছে। প্রাসাদের সংস্কার করবার কোন উৎসাহ নরহরির ছিল না। তিনি তারই পাশে ছোট একটা কোঠাঘর তৈরী করিয়ে নিয়ে তাতেই নিতান্ত সাধারণ ভাবে বাস করতেন। লোকে অনুযোগ করলে হেসে বলতেন,—অত অগুণতি ঘর নিয়ে থাকলে বার হব কোথায়!

নরহরির এসব পাগলামিতে হয়ত কিছু আসত যেত না। কিন্তু তাঁর এক সাংঘাতিক বাতিক ছিল। তিনি যত রাজ্যের

বেদে ডাকিয়ে নানারকম বিষধর সাপের বিষ সংগ্রহ করতেন। কোথা থেকে তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল ঢুকেছিল যে এই সব সাপের বিষ থেকে এমন এক ওষুধ তিনি তৈরী করবেন, যা হবে মৃতসঞ্জীবনী। যাতে মরণ তাইতেই জীবন এই ছিল তাঁর বুলি। সারা দিন রাত তাঁর বেদেদের সঙ্গে আর বিষ নিয়েই কেটে যেত। বিষ থেকে তিনি অমৃত ছেঁকে তুলবেন পৃথিবীর সমস্ত আধিব্যাধি তাতে দূর হয়ে যাবে —এই ছিল তাঁর ক্ষ্যাপামি! তাঁর স্ত্রী একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে মারা গেছলেন অনেক আগে। ছেলেটিকে তার মামারা এই পাগল বাপের প্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্যে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে মানুষ করছিল। নরহরির বাতিকে বাধা দেবার সুতরাং আর কিছু ছিল না। সারাদিন তিনি নানা রকমের বিষ জাল দিতেন, কত কি মেশাতেন আর কি যে পরীক্ষা করতেন কেউ জানে না। কিন্তু অমৃত আর তাঁর হাতে তৈরী হল না। শুধু 'নরহরির বড়ি' বলে এ-অঞ্চলের একটা কথা এখনো তাঁর ব্যর্থ সাধনার প্রতি বিদ্রূপ বহন করে আসছে। সামন্তদের বিরাট জমিদারীতে অনেকদিন ধরেই গোলমাল চলছিল। তারপর কয়েক বছর উপরি-উপরি অজন্মা অনাবৃষ্টি হয়ে হঠাৎ দেখা দিল দারুণ দুর্ভিক্ষ। আগের বছর চাষীরা মাঠ থেকে শুধু কটা শুকনো খড় ঘরে তুলে এনেছে। পেটের জ্বালায় বেশীর ভাগ চাষী তাদের বীজধান খেয়ে শেষ করেছে। যারা উপোস করে একবেলা খেয়ে বীজ ধান কোনমতে বাঁচিয়েছে তারাও আকাশের দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে। জ্যৈষ্ঠ গেছে আষাঢ় যায় যায়— আকাশ যেন দেবতার কোপ দৃষ্টি—শুধু আগুন ঝরছে।

আকাশ যেমন শুকনো, ভদ্রেশ্বরীর মন্দির তেমনি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মেঘের জন্যে জলের জন্যে ভদ্রেশ্বরীর কাছে দিনরাত পূজা মানতের আর বিরাম নেই। দেশে বলির জন্যে ছাগল মহিষ দুর্লভ হয়ে এল। বিদেশী

একদল বেদের সঙ্গে নরহরি বুঝি বেরিয়েছিলেন সুষণোডাঙ্গায় সাপের খোঁজে। তারা নাকি তাঁকে চন্দ্রচূড়ের টাটকা বিষ জোগাড় করে দেবে। বেরুবার পথে ভদ্রেশ্বরীর সামনে দিয়ে প্রণাম করে আসতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রক্ত! রক্ত! চারিদিকে শুধু রক্ত! তার মধ্যে একটি পাঁচ ছ বছরের ছোট উলঙ্গ মাঝিদের মেয়ের কান্না তাঁর কাণে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধল। ছোট একটা মিশকালো ছাগল ছানা দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে হাপুস নয়নে কাঁদছে। ছাড়বে না সে কিছুতেই তার ছাগল ছানা ছাড়বে না। অনেকক্ষণ তার বাপ, মা, আশপাশের লোক বুঝি বুঝিয়েছে। বলেছে,—নতুন ছাগল ছানা অমন কত হবে, একটার বদলে অনেক ছানা তাকে দেওয়া হবে। বোকা মেয়ে তবু অঙ্কের হিসেব বোঝে না। বিরক্ত হয়ে ছাগল ছানাটাকে তারপরে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল সবাই। স্বয়ং নরহরি সামন্ত উপস্থিত। পুরোহিত থেকে খাঁড়াধারী পর্য্যন্ত সবাই নিজেকে একটু বেশী করে জাহির করবার জন্যে ব্যাকুল। কে একজন ঠাট্টা করে শাসিয়ে গেল,—আর কাঁদলে ও পাঁঠার সঙ্গে তাকেও বলি দেওয়া হবে।

মেয়েটা আর কাঁদল না। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলির উদ্যোগ-অনুষ্ঠানের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। অনুষ্ঠান সাঙ্গ হল। বলির পাঁঠার কপালে সিঁদুর লাগান হল, গলায় উঠল রক্তজবার মালা। তারপর নিপুণ হাতের এক কোপে যূপকাষ্ঠে গলান পিছমোড়া দিয়ে টানা ধড় থেকে তার মাথাটা খসে পড়ল মাটিতে। ছুঁড়ে-দেওয়া রক্তাক্ত ধড়টা তখনও ছটফট্ করছে। মেয়েটা চীৎকার পর্য্যন্ত করল না শুধু তার ছোট্ট কোমল মুখটা কেমন যেন একবার শিউরে সিঁটকে উঠল। তার মাকে কারা ধমক দিয়ে উঠল,—মেয়েটা সিটিয়ে গেল যে! জল দাওমা মুখে! বলিহারি আক্কেল! আহ্লাদ করে অমন মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছিলেই বা কেন?

নরহরি সামন্ত সেখান থেকে ফিরে এলেন। তাঁর প্রণাম অনেক আগেই সারা হয়েছিল কিন্তু এতক্ষণ তিনি কেন কে জানে সেখান থেকে নড়তে পারেন নি!

পরের দিন সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনলে ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরে বলি বন্ধ হয়ে গেছে, – নরহরির আদেশ। চারিদিকে আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু নরহরির আদেশের নড়চড় হল না! নরহরির এইটিই নাকি চরম ও শেষ ক্ষ্যাপামি।

বৃষ্টি নেই। আকাশে মেঘ যদিবা দেখা দেয়, কোথা থেকে আগুনের হল্কার মত ঝড় এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। লোকে বললে, ভদ্রেশ্বরীর শাপ লেগেছে। দেখতে দেখতে দুভিক্ষের সঙ্গে মড়ক দেখা দিলে। কাতারে কাতারে গ্রামে গ্রামে লোক মারা যেতে লাগল। বড় ছোট ইতর ভদ্র সবাই এসে ধন্না দিয়ে পড়ল নরহরির কাছে। ভদ্রেশ্বরীকে শান্ত করুন, – আবার বলির আদেশ দিন।

নরহরি অটল। রক্তের দামে জল কিনব না,—দেবীর কাছেও নয়, এই তাঁর বুলি। হতাশ হয়ে সবাই ফিরে গেল। মড়ক সর্ব্বনাশা রূপ ধরলে। দেশে বুঝি আর মানুষ থাকবে না। দেবীর ভক্তদের মুখে শোনা গেল, বলি বন্ধ করার এত বড় অপমান দেবী কখন ক্ষমা করবেন না। যদি ক্ষমা করেন তাহলে ছাগরক্তে আর নয়। নররক্ত চাই।

দেশব্যাপী হাহাকার। নরহরি বাইরে বার হতে পারেন না। শ্মশান আর গ্রাম এক হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যেও তাঁর নিশ্চিন্ত মনে অমৃত গবেষণার উপায় নেই। ক্ষুধার্ত্ত রোগোন্মত্ত গ্রামবাসীর দল তাঁর ঘর পর্য্যন্ত চড়াও হয়ে আসে। ভদ্রেশ্বরীর প্রৌঢ় পুরোহিত একদিন ঝড়ের মত এসে উপস্থিত হলেন। উন্মাদের মত তাঁর চেহারা, মহামারীতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সব নিয়ে শুধু তাঁকে ফেলে গেছে। পুরোহিত

ক্ষিপ্তভাবে যেন অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নরহরিকে বল্লেন,—তুমি নাস্তিক, তুমি পাষণ্ড, তুমি বংশের কলঙ্ক, বামাচারী পিশাচ। সমস্ত দেশ তুমি শ্মশান করে দিয়েছ নিজের দম্ভে। তবু কি তোমার তৃপ্তি নেই। দেবী রক্ত চান। এখনো হয়ত সময় আছে। এখনো তাঁকে তুষ্ট কর। নইলে কেউ রক্ষা পাবে না।

পুরোহিত আরো অনেক কিছু বল্লেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নরহরি বল্লেন,—আপনি যান। দেবীকে আমি তুষ্ট করব।

তার পরদিনই সকালে নাকি নরহরির মৃতদেহ পাওয়া গেছ্‌ল দেবীর মন্দিরে, তাঁর গর্ভগৃহের সামনে। কেউ বলে তিনি নিজের হাতে নিজের শিরশ্ছেদ করেছিলেন, কেউ বলে যে-বিষ তিনি অমৃতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন তারই পাত্র নাকি ছিল তাঁর হাতে।

দেবী তুষ্ট হলেন কিনা বলা যায়না। কিন্তু বৃষ্টি হ'ল একেবারে আকাশ ভেঙে অবিরাম। অতিবৃষ্টিতে দেশ ভেসে গেল, সেই সঙ্গে সামন্তদের সমস্ত আধিপত্য-গৌরব।

নরহরির যে ছেলে মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছিল তাকে গ্রামে ফিরিয়ে এনে নরহরির শ্বশুরকূল অনেক চেষ্টা করলে এ ভাঙনকে ঠেকাবার, কিন্তু বন্যা বাঁধ মানলেনা। দেশের চেহারা চারিদিকে তখন বদল হচ্ছে। ঢাকা থেকে দেওয়ানী দপ্তর সরে এসেছে মুর্শিদাবাদে। চৌধুরীরা ভালো করেই মাথা চাড়া দিয়েছে। মুর্শিদাবাদের 'রায়রায়ানে'র দপ্তরে তাদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। সেখান থেকে মুকুন্দরাম চৌধুরী নতুন ফার্সি বয়েৎ আর তার চেয়ে বেশী জৌলুষের বাদসাহী মোহর আমদানি করে সামনবেড়ের চাকা একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। সামনবেড় থেকে এর আগে কেউ আর ম্লেচ্ছ যবনের চাকুরী করতে চায়নি। কিন্তু মোহরে সব দোষ খণ্ডায়, দেখতে দেখতে সামন্তদের তালুক মুলুক একে একে চৌধুরীদের হাতে গিয়ে উঠল।

স্বয়ং ভদ্রেশ্বরীও ভাগ্যবানের উপর গিয়ে ভর করলেন। ধ্বসে-যাওয়া ভাঙ্গা ভিটেতে আরো কয়েক পুরুষ সামন্তদের সন্ধ্যে প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলল। তারপর একদিন আর সে আলো দেখা গেল না। বছর সত্তর আশী আগে দীননাথ সামন্ত তাঁর স্ত্রীকে এখানকার শ্মশানে রেখে সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে এ পোড়ো ভিটে ছেড়ে চলে গেছলেন। তারপর আর তাঁদের কথা সামনবেড়েতে শোনা যায়নি। সামন্তদের বিরাট বাসভূমির ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলে ঢেকে গিয়ে বিষাক্ত সাপ ও গ্রামবাসীর কল্পনায় তার চেয়ে ভয়ঙ্কর অপদেবতার আশ্রয় হয়ে উঠেছে।

ভদ্রেশ্বরী চৌধুরীদের উপর অনুগ্রহ করে আসছেন সেই থেকে। তাঁর বলি নরহরির মৃত্যুর পর থেকেই আবার প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়। দীননাথ সামন্ত যখন সামনবেড়ে ছেড়ে যান তার আগেই চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ রামদয়াল চৌধুরী বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছেন। ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরে রক্তপাত তখন থেকে বন্ধ! ছাগ-শিশুর বদলে সেখানে কুমড়ো বলি হয়। শ্যামসুন্দরই এখন চৌধুরীদের প্রধান উপাস্য। কিন্তু ভদ্রেশ্বরীর অপমানিত বোধ করার কোন লক্ষণই নেই। দুর্ভিক্ষও লাগেনি মহামারিও নয়। চৌধুরীদের দিন দিন সবদিক দিয়ে বাড়বাড়ন্তই দেখা যাচ্ছে।

অমলের হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গল। রবি, বামুন পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকে ডাকছে—কিরে ডবল পাহারা দেবার মতলব নাকি। বাড়ি ফিরতে হবে না?

দলের সবাই এগিয়ে গেছে যে যার বাড়িতে। একা রবিই দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়। দাঁড়িয়ে থাকাটা নিছক বন্ধুপ্রীতি নয়। দুজনে এক পাড়াতেই থাকে বটে তবে বড় রাস্তা থেকে যে-পথটা মনসা-তলা দিয়ে তাদের বাড়ির দিকে গেছে সেখানে রবির আর একটা ভয়ের জায়গা আছে।

হারাণ বুড়ো মরবার পর থেকে তার বাড়ির পাশে বাদামতলায় ডোবার কাছটা নাকি মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। বুড়ো হারাণ নাকি অনেক টাকা কোথায় গোপনে পুঁতে রেখেছিল! মরবার সময়, এতদিন ধরে যার সেবা খেয়েছে, সেই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী বিধবা ভাগনীকে সে পোতা টাকার গোপন সন্ধান দিতে গিয়ে কিছুতেই নাকি জায়গাটা নিজেই সে মনে করতে পারেনি! এমনি তার তখন ভীমরতি। সেই আপশোষ নিয়ে মরে সে নাকি এখনও সেই গুপ্ত ধনের সন্ধানে রাত্রে এই বাদামতলার ডোবার পাশে ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে বেড়ায়। রবি রাত্রে তাই পারতপক্ষে সেখান দিয়ে একলা যায় না!

দুজনে নিঃশব্দেই আগু-পিছু সঙ্কীর্ণ পথটা পার হয়ে যাচ্ছিল। চাঁদ এখন আরো খানিকটা উপরে উঠে এসেছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে ঝোপ-ঝাড় গাছের ছায়ায় পথটা আলো-আঁধারি। হঠাৎ পেছন থেকে রবি অমলের জামাটা টেনে ধরে ভীত অস্ফুট গলায় বলে, দেখেছ।

অমলও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয় তার একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু রবির মত অমন 'আটাশে' তাকে বলা যায় না। কিন্তু সত্যিই বাদামতলায় ডোবার ধারে একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি যে দেখা যাচ্ছে!

খানিক দুজনেই চুপ করে থাকে। তারপর মূর্ত্তিটা একটু নড়তেই অমল হাঁক দেয়—কে। কে ওখানে? ভেতরের অস্পষ্ট ভয়ের দরুণই তার হাঁকটা একটু বেশী জোরেই বার হয়।

ডোবার পার থেকে মূর্ত্তিটা এবার তাদের দিকেই আসতে আসতে বলে,—আমি গো আমি! দাগী চোর—ধরবি নাকি!

এবার রবিই লজ্জিত হয়ে বলে,—আরে! সিধু খুড়ো! দেখেছ ক্ষ্যাপার কাণ্ড!

গলাটা একটু চড়িয়ে সে তারপর বলে,—এত রাত্রে ঝোপে জঙ্গলে কি করছ সিধু খুড়ো !

চুরি করছি বাবা, চুরি করছি—আমায় ধরে নিয়ে যাবি না ?—সিধু খুড়ো তাদের সামনে এসেই দাঁড়ায়। এই শীতেও কোমরে একটা খাটো কাপড় ছাড়া আর কিছু তার গায়ে নেই। আবছা অন্ধকারে দাড়ি গোঁপ সমেত বিরাট দীর্ঘ চেহারাটা সত্যি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

ভয় করবার তাকে কিন্তু কিছু নেই। অমল হেসে বলে,—ধরব কি করে ? হাতকড়া নেই যে !

তবে, কি ছাই তোদের রাত পাহারা ! রাতে নয় বাবা, রাতে নয়—পাহারা দেবে দিনমানে। যত চুরি সব দিনের বেলায় ! সিধু খুড়ো নিজের মনেই বকতে বকতে চলে যায়।

রবি ও অমল একটু হেসে আবার এগিয়ে চলে। পেছন থেকে হঠাৎ বেসুরো কর্কশ গলায় সিধু খুড়োর গান শোনা যায়,—

তোর বিচারের এম্‌নি মজা !
সাবাস হল দিনের চুরি,
শুধু রাতের চুরির বেলায় সাজা !

রবি সসম্ভ্রমে বলে,— সীধু খুড়ো অমনি ক্ষ্যাপা সেজে থাকে,- বুঝেছিস্। আসলে ও সিদ্ধ পুরুষ ! মুখে মুখে যখন তখন কি রকম গান বাঁধে দেখছিস্।

পথে প্রথমেই রবিদের বাড়ি পড়ে। সে বিদায় নিয়ে চলে যায়। অমল খানিকটা এগিয়ে তাদের নিজেদের বাড়ি ঢোকে। বার বাড়ির উঠানে অনেকগুলো গরুর গাড়ি বিরাট ফড়িংএর মত ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে। মধুবন থেকে প্রজারা বৎসরের বরাদ্দ কাঠ এনেছে। এখনো মাল খালাস

হয় নি। আশপাশের গরুগুলোর ভারী নিশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তারই সঙ্গে মানুষের নাক ডাকার শব্দ। বারদালানের বারান্দায় গাড়োয়ানেরা যে যেখানে পেরেছে কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

বারদরজাটা ভেজানই ছিল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পুরোনো আমলের সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে অমল নিজের ঘরের দিকে চলে।

সারা বাড়ি নিশুতি। অমল খেয়ে দেয়েই রাত-পাহারায় বেরিয়েছিল। সুতরাং তার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই। কিন্তু ওপরের বারান্দায় ঢোকবার মুখেই দরজায় আলো দেখা যায়। সঙ্গে মৃদু চুড়ির আওয়াজ।

অমল জিজ্ঞাসা করে—কে? মঞ্জু নাকি?

মৃদু হাসির সঙ্গে শোনা যায়,—কটা ডাকাত ধরে আনলে গো অমল দা।

অমল দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে বলে,—ধরেছিলাম একটা। আনতে পারলাম না।

কাকে গো?

আমাদের সিধু খুড়োকে:

মঞ্জরীর মুখে এবার সত্যি উদ্বেগ দেখা যায়।

বলে,—সিধু খুড়ো বুঝি আবার গাঁয়ে এসেছে! এতদিন কোন শ্মশানে-মশানে ছিল কে জানে! কিন্তু ওকে যেন কিছু বোলোনা! জানো ত ও পিশাচসিদ্ধ কাপালিক, রাগলে কি না করতে পারে!

অমল হেসে বলে,—আচ্ছা উপদেশটা মনে রাখব। কিন্তু এত রাত পর্য্যন্ত তুই জেগে যে?

কি করব বল, দুপুর রাতে ছ'গাড়ি কাঠ নিয়ে এল, গাড়োয়ানগুলোকে ত আর উপোস করিয়ে রাখতে পারিনা। এইত খানিক আগে সব

পাট চুকল। তারপরও কি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে যাবার যো আছে—পাশের বাড়িতে যদি ডাকাত পড়া শোরগোল হয়।

ডাকাত পড়া শোরগোল আবার কিসের!

কুমুদ ডাক্তারের দরজায় দুম দুম করে লাথি গো—ওই সেই ভূতুড়ে বাড়ির নেপালি চাকরটার কীর্ত্তি।

নেপালি নয় সে বর্ম্মী—অমল শুধরে দিয়ে বলে,—কিন্তু রাতদুপুরে ডাক্তারের বাড়িতে কেন! কারুর অসুখ নাকি?

হবে নিশ্চয়। কুমুদ ডাক্তার ত প্রথম বেরুতেই চায় না। আর তারই বা দোষ কি! রাত দুপুরে সামন্তদের সেই ভূতুড়ে ভিটেতে কেউ সাধ করে যায়!

ডাক্তার গেছে ত শেষ পর্য্যন্ত? অমল একটু কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞাসা করে।

পাগল! সে আবার যায়। সে নিজে বলে বাতে পঙ্গু। এই শীতের রাতে আধ ক্রোশ হেঁটে সেই ভাঙ্গনে যাবে। সব শুনেটুনে কি একটা ওষুধ দিয়ে বল্লে, সকালে যাবে।

তাচ্ছিল্য ভাবেই প্রসঙ্গটা শেষ করে মঞ্জরী বলে, তোমার গরম জল দরকার থাকে ত বল, এখনো উনুনে আঁচ আছে।

অমলের শরীর খুব সবল নয়, কিন্তু উৎসাহটা সব সময়ে স্বাস্থ্যের মাত্রার খেয়াল রাখে না। পরে ধাক্কা সামলাতে তাই তাকে অনেক কিছু করতে হয়। শীতের রাতে পাহারা সেরে এসে এক একদিন ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সে গরম জলে নুন দিয়ে কুল্লা করে। অবশ্য মঞ্জরীর কৃপাতেই গরম জল জোগাড় হয় অত রাত্রে।

আজ কিন্তু ওসব দিকে অমলের মন নেই। সে মাথা নেড়ে জানায় গরম জল তার আজ লাগবে না। তারপর একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলে,—

কুমুদ ডাক্তারের কিন্তু যাওয়া উচিত ছিল। অতরাত্রে ডাকতে এসেছিল, কিছু বিপদ নিশ্চয় হয়েছে।

মঞ্জরীর কিন্তু রুগীর চেয়ে ডাক্তারের ওপরই সহানুভূতি বেশী। বলে,—ডাক্তারেরও ত মানুষের শরীর। বুড়ো বেতোরোগী ঠাণ্ডা লাগিয়ে মারা পড়বে নাকি।

কথাটা তারপর ঘুরিয়ে মঞ্জরী বলে,—তোমার মশারী আমি ফেলে গুঁজে দিয়ে এসেছি। যাও শুয়ে পড়গে। আর মাথার দিকের জানালাটা যেন খুলোনা আবার।

বাতিটা হাতে নিয়ে মঞ্জরী নীচে চলে যায়।

বিছানায় শুয়ে অমলের কিন্তু প্রথমটা ভালো করে ঘুম আসে না। আধ-তন্দ্রার আচ্ছন্নতার মধ্যে অসংলগ্ন চিন্তার জট্। ভদ্রেশ্বরী······পিশাচসিদ্ধ সিধু খুড়ো······অমৃতসন্ধানী নরহরি······সামন্তদের ভূতুড়ে ভিটের অপরিচিত বুড়ো আর তার মেয়ের রহস্য······কে জানে কার গুরুতর অসুখ হয়েছে হঠাৎ······কুমুদ ডাক্তার ছাড়া গাঁয়ে আর ডাক্তার নেই····
ডাক্তার একজন এখানে অত্যন্ত দরকার। পাশ করে এসে সেও ত গাঁয়েই বসতে পারে······না তা হবার নয়····· বড় সঙ্কীর্ণ জীবন······চারি ধারে বেড়া দেওয়া······অদ্ভুত মেয়ে মঞ্জরী, সেবায়, যত্নে, শুশ্রূষায়, মায়া, মমতায়, তার তুলনা মেলে না। একা এই এত বড় সংসার সেই চালায় বল্লে, হয়। যাকে সে চোখে দেখতে পায়, হোক সে সামান্য অচেনা গরুর গাড়ির গাড়োয়ান,—তার জন্যে কোন পরিশ্রম কোন কষ্ট সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তার নিজের ছোট গণ্ডির বাইরে যাকে সে চোখে দেখেনি তার কোন দাম তার কাছে নেই। হোক সে অসহায় বিপন্ন·· ···হোক সে অসুস্থ······

অনেক রাত্রে শুয়েছে। সকালে অমলের ঘুম ভাঙল একটু বেলায়।

মঞ্জরী হাত গুণতে জানে বোধ হয়। তার ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে চায়ের বাটিটি নিয়ে সে ঘরে ঢুকল।

চায়ের বাটিটা তেপয়ের ওপর রেখে মশারি গুটোতে গুটোতে সে বল্লে, তোমার আর রাত পাহারায় যেতে হবেনা বাপু। বেলা নটা পর্য্যন্ত ঘুম। এতে শরীর খারাপ হয় না?

মশারি গুটিয়ে বিছানা তুলে মঞ্জরী চলে গেল।

চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে অমল তখন জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলা অনেকটা হয়েছে বটে, শরীরেও কেমন একটা জড়তা। তবু শীতের সকালের রোদটা কি মিষ্টিই না লাগছে। দূরে চৌধুরীদের শ্যামসুন্দরদের রাসমঞ্চের চূড়োটা আম কাঁটালের বনের মাথায় ঝক ঝক করছে সোনালী রোদে। আর একদিকে কুমুদ ডাক্তারের দোতলা দালান আর তাদের বারবাড়ির দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সুদূর দিগন্তের একটা ফালি দেখা যাচ্ছে—ধান কেটে নেওয়া শূন্য মাঠ তার ওপারে সুষ্‌নো ডাঙার রাঙা মাটির ঢেউ। এখানে ওখানে ছড়ানো বাবলা বন যেন আকাশে সেই ঢেউয়ের ছিটে। কি অপরূপই লাগছে শীতের এই প্রসন্ন নীল আকাশের তলায়। পৌষের আকাশের চোখে মধুর একটি পরিতৃপ্তি। ঘরে ঘরে সে মরাই ভরে দিয়েছে ধানে। অতি দুঃখীর মুখেও হাসি ফুটিয়েছে সুদিনের······

অমল মুখ হাত ধুয়ে চৌধুরীদের বাড়িতেই একটু যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় মোহিত এসে বলে,—বোয়ানবাদী যাবে অমলদা,—চল যাই। শিউলিরা কাল নতুন 'লবাং' তৈরী করেছে, নিয়ে আসব।

অমলের এসব ব্যাপারে উৎসাহ নেই। তবু মোহিতের আগ্রহ দেখে তাকে নিরাশ করতে তার ইচ্ছে করে না। আপত্তি না করে মোহিতের সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির উঠোন দিয়ে যাবার সময় খিড়কী পুকুরে

চুবড়ি হাতে মাছ ধুতে যেতে যেতে মঞ্জরী বলে,—অমলদাকে নিয়ে বেরুচ্চ, আজ কিন্তু সেদিনকার মত বেলা দুপুর কোরোনা ছোড়দা। শীতের দিনে ভাত তরকারী সব জল হয়ে থাকবে!

আচ্ছা আচ্ছা, তোকে আর মুরব্বিয়ানা করতে হবে না। মোহিত তাচ্ছিল্যের স্বরেই বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু স্বরটা তার নরম।

মোহিত মঞ্জরীর বড় ভাই,—বছর কয়েকের বড়। কিন্তু বেঁটে খাটো ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ চেহারা—দেখায় যেন মঞ্জরীর ছোট। মঞ্জরীকে আর সবাইকার মত সে, একটু সমীহ করে চলে। মোহিতকে দেখলে অমলের সত্যি কেমন মায়া হয়। একেবারেই পাড়াগাঁয়ের ছেলে,—চেহারায় চিন্তায় পোষাকেআষাকে সব বিষয়েই কেমন একটা জড়তা। লেখাপড়া করবার বেশী সুযোগ তার হয়নি। সাংসারিক অভাব, তার ওপর, রোগ তার লেগেই আছে। বাড়ির আর সবাইকার চেয়ে ম্যালেরিয়া যেন তাকেই বেশী করে পেয়ে বসেছে। হেমন্ত গিয়ে শীত এসেছে, তবু এখনো ঘুরে ফিরে সে জ্বরে পড়ছে। সুস্থ থাকলে চাষ আবাদ জমি জমা সে একটু আধটু দেখা শোনা করে। সে বিষয়ে তার উৎসাহ কিন্তু যথেষ্ট। জমিজমা চাষবাস সংক্রান্ত এত খুঁটিনাটি সে জানে যে অমলের অবাক লাগে। মনে হয় এই পাড়াগাঁয়ের জগৎই বুঝি তার সব। তাই নিয়েই সে খুসী। কিন্তু আসলে সে তা নয়, এইখানেই মুস্কিল। মোহিত শহরে যেতে চায়, কলকাতাই তার কল্পনার স্বর্গ। সেখানে সে একটা পানের দোকান দেবে, না হয় অফিসে বেয়ারাগিরি করবে—তবু এই গ্রামে সে পচে মরবে না। কি আছে এখানে? সকাল থেকে সন্ধ্যা, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বৎসর সব এখানে নির্দ্দিষ্ট বাঁধা ধরা। বড় জোর কোন বছর বৃষ্টি হবে বেশী, কোন বছর হবে না। কোনবার আক ফলবে ভাল, কোনবার ধান, কখন ধানে পোকা লাগবে, কখন বেগুনের গোড়া যাবে পচে। বর্ষায় আগাছার জঙ্গল বাড়বে, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া দেখা

দেবে, লোকে ভুগবে, মারা যাবে, সেরে উঠবে। বুড়োরা সারা শীত কাশবে আর একটু একটু করে বিশাই নদীর ধারের শ্মশানের দিকে এগুবে। সেইত তাদের জীবনের সীমানা। না, মোহিত এখানে কিছুতেই থাকতে চায় না। এখানে সব কিছু তার মুখস্থ হয়ে গেছে, কার ক্ষেতে কত ধান, কার বরোজে কত পান, কোন গাছের জাম আগে পাকবে, কার পুকুরের জল আগে শুকোবে কিছুই তার আর জানতে বাকি নেই। সে তাই অজানা রহস্যময় সেই অদ্ভুত রূপকথার পুরীতে যেতে চায়, সেখানে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আশ্চর্য্য কিছু, অবিশ্বাস্য কিছু, ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যেখানে সে মোটরে চাপা যেতে পারে, হয়ত মোটরে চড়তেও পারে, ফকির হতে পারে কিম্বা হঠাৎ এক লহমায় আলাদীনের প্রদীপ পেয়ে যেতে পারে। যেখানে প্রতিদিন সেই এক চেনা মুখ ঘুরে ফিরে দেখতে হয না, যেখানে অন্তহীন আকস্মিকতা, যেখানে চমকের অফুরন্ত মিছিল।

অমলের সঙ্গে যাবার জন্যে তাই সে এত লালায়িত। অমল সেই কল্পনার স্বর্গের প্রতিনিধি। ইচ্ছা করলে সে তাকে একটা কাজ কি সেখানে দিতে পারে না একটা কোন সুযোগ, শুধু একটু দাড়াবার জায়গা। আজও সে একবার কথাটা পাড়ে। অমল হেসে বলে,—পাগল, এখন কেউ যায়! লোকে বলে সেখান থেকে পালাতে পেলে বাঁচে।

মোহিত কিন্তু সে কথা বোঝে না। কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা তার কাছে একটা অর্থহীন ছেলেমানুষী। বোমার ভয় তার নেই, বোমা কি জিনিষ সে কল্পনাই করতে পারে না ভালো করে। সামনবেড়ের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে এরোপ্লেন উড়ে যায়—সে দেখেছে। সে এরোপ্লেন ত একটা পরম বিস্ময়ের বস্তু! লোকে বলে, সেই এরোপ্লেন উড়ে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে, তা থেকে বাজের মত বোমা পড়বে, সহর ফেটে চৌচির। এমন দৃশ্য দেখবার জন্যে এই ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ জীবনটার সে তোয়াক্কা রাখে নাকি?

তা ছাড়া সহরে কি কেউ আর নেই। যারা পালাবার তারা পালিয়েছে, সহর ত' চলছে। সেই সহরেই সে যেতে যায়। লেখাপড়া সে ভালো জানে না, পরিশ্রম করবার তার তেমন ক্ষমতা নেই,—না থাক তবু সেখানে একবার যেতে পারলে সে একটা পথ খুঁজে বার করবেই। সাধন তেলীর ছোট ছেলেটা যে সেবার পালিয়ে গেছল। লেখাপড়া সেই বা কি জানে। শরীরও তার এমন কিছু সবল নয় মোহিতের চেয়ে। তবু সেও ত সেখানে একটা কাজ জোগাড় করে নিয়েছে, কি একটা পাঁউরুটি বিস্কুটের দোকানে। মোহিত কি তার চেয়ে অযোগ্য। অমলদা ইচ্ছা করলেই তাকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারে,—তার কত চেনা লোক সেখানে!

অমল হেসে তাকে আশ্বাস দেয়—আচ্ছা আর দু'দিন যাক, যুদ্ধটা কোন দিকে যায় দেখা যাক্, সেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে!

মোহিতের জন্যে অমলের সত্যি দুঃখ হয়। কেন তার মধ্যে এই অদ্ভুত আত্মঘাতী দুরাশা। কলকাতা যে কি, তা তার ধারণাই নেই। তার মত ছেলে সেখানে কি করতে পারে! নির্ব্বিকার নির্ম্মম মহানগরের বিরাট রথচক্রে তার মত কত নিষ্ফল জীবন প্রতিদিন গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যাচ্ছে সে জানে না। কলকাতা মোহিতের কাছে হয়ত একটা বিরাট মুক্তি। সে ত জানেনা সেখানে আকাশ কত ছোট হতে পারে—এই গাঁয়ের চেয়ে কত সঙ্কীর্ণ।

অবশ্য এখানেও মোহিতের মত ছেলের জীবন ঈর্ষা করবার মত নয় অমল বোঝে। অত্যন্ত দুঃস্থ দরিদ্র পরিবার। জমি-জমা কিছু তাদের নেই বল্লেই হয়। রুগ্ন স্বামী মারা যাবার পর অনাথ ছেলেটি ও মেয়েটি নিয়ে মোহিতের মা অকুল পাথারে পড়েছিলেন। অমলের মায়ের সঙ্গে তাঁর দূর সম্পর্কের কি রকম একটা সম্বন্ধ আছে। অমলরা বহুদিন থেকে গ্রাম ছাড়া, কালে ভদ্রে গাঁয়ের বাড়ীতে আসে! ক্ষেত খামার থেকে

ঠিক মত আদায় হয়না, বাগানের ফল মূল যে পারে লুটে খায়। তাই, মোহিতদের দুঃখ দেখে বিশেষ করে নিজেদেরও বাড়ী ঘর ক্ষেত বাগান দেখা শুনো হবার স্থবিধে হবে বলে অমলের মা তাদের এ বাড়ীতে এসে থাকতে দিয়েছেন। সে প্রায় বছর আষ্টেক হল। মোহিতদের তাতে অন্নকষ্টটা ঘুচেছে। অমলদের গাছের যা কিছু ফল ফসল তারাই ভোগ করে। অমলদের তাতে আপত্তি নেই। গাঁয়ের বাস তারা ছেড়েই দিয়েছে। এবার বিপদে পড়েই নেহাৎ এখানে আসা। ঈর্ষ্যাতুর গাঁয়ের লোক অবশ্য কলকাতায় গিয়ে মোহিতের মার নামে তাদের কাছে লাগাতে কসুর করেনা। অমলদের জমিজমা থেকে তিনি নাকি বেশ দু'পয়সা করে নিচ্ছেন। নিজেদের বাপ পিতম'র সম্পত্তি এভাবে লুট হতে দেওয়া তাদের উচিত নয়, ইত্যাদি। অমলের মা সামনে তাদের প্রতিবাদ করেন নি। পরে হেসে বলেছেন—একজনের বদলে সবাই লুট করে খেলে বোধহয় আমার বেশী স্থখ হতো! না, আপাততঃ মোহিতদের ভাবনার কোন কারণ নেই। অমল বা তার মা, মোহিতদের পারত পক্ষে আশ্রয়চ্যুত করবেন না। তাঁদের দরকারই বা কি? সহরের বাড়ীঘর ছেড়ে গ্রামে এসে বাস করবার কোন ব্যাকুলতা তাঁদের নেই। আপাততঃ বাধ্য হয়েই ক'দিনের জন্যে এসেছেন। মোহিতরা যতদিন খুশী এখানে থাকতে পারে। কিন্তু হাজার হলেও পরের বাড়ী, ঘর, সম্পত্তি, চেষ্টা করলেও একেবারে সেকথা ভুলতে পারা বোধহয় সম্ভব নয়। স্থতরাং মোহিতের কোনদিকে কি আশা করবার আছে? প্রত্যক্ষ না হলেও পরের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর। তার ওপর মঞ্জরীর বিয়ের ভাবনা। পাড়াগাঁয়ের হিসেবে তার বিয়ের বয়স অনেক দিন পার হয়ে গেছে। আগেকার দিন হলে কথা উঠতো, আজকাল ঘরে ঘরে একই অভাবের সমস্যা। তাই কোনরকমে মুখ বন্ধ আছে। কিন্তু আর বেশী দিন থাকবে না।

অমলের মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। প্রথম ঘুম ভেঙে ওঠার সে প্রসন্নতা কখন গেছে হারিয়ে। গাঁয়ের সে নির্লিপ্ত চোখে-দেখা রূপ আর নেই। পদে পদে এঁদো ডোবা অরে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রামকে এখন অন্যরকমই দেখায়। রাত্রের সে রহস্য-মায়াও নেই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখবার। নোংরা এলোমোলা উদ্দেশ্যহীন, ভাবে সাজান ঘরবাড়ীর জটলা। না আছে শ্রী না ছাঁদ। বেশীর ভাগই অস্পষ্ট হাড়-বার-করা নোনা-ধরা ইটের ধ্বংসাবশেষ,— ডাইনে বাঁয়ে পানায় পচা ডোবার বিষ-নিশ্বাসে ধুঁকছে। এই নাবাল স্যাঁৎসেতে জমি শুধু চাষেরই উপযুক্ত। কতবার অমলের মনে হয়েছে এ গ্রামের যারা পত্তন করেছিল তারা পাশেই সুষণোডাঙার উঁচু শুকনো রাঙামাটি ছেড়ে এই অস্বাস্থ্যকর নীচু জমিতে কি জন্যে প্রথম ভিৎ গেড়েছিল। শুধু বোধহয় জলের সুবিধের জন্যে। মাটি আঁচড়ালেই যেখানে জল ওঠে সেই তাদের কাছে স্বর্গ। তারা আশু সুবিধেটাই দেখেছে, ভবিষ্যৎ বিপদটা ভাবেনি। কিম্বা তাদের এ বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না। নিজেদের চাষ-আবাদের মাঝখানেই তারা থাকতে চেয়েছে, চোর ডাকাতের ভয়ে বাড়ীগুলো গায়ে গায়ে ঘেঁসা-ঘেঁসি করে তাল পাকিয়ে উঠেছে, মাটির বিস্ফোটকের মত। কারণে অকারণে যেখানে সেখানে তারা ডোবা কেটেছে ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের রাস্তা প্রশস্ত করতে।

গ্রামের সীমানা পেরিয়ে তারা এখন সুষণোডাঙার কাছাকাছি এসে পড়েছে। সুষণোডাঙার এই দিকটায় কিছুদিন থেকে ক'ঘর সাঁওতাল এসে বসতি করেছে। গাঁয়ের কুশ্রীতার পাশে তাদের ঝকঝকে তকতকে শুকনো নিকানো উঠোন, ছোট্ট কুঁড়েগুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপ বড় বেশী চোখে পড়ে। সাঁওতালরা গরীব। গাঁয়ের নেহাৎ নিরেস অকেজো জমি তারা ভাগে চাষ করতে পায়, কেউবা অতি সামান্য মজুরিতে লোকের বাড়ী

খাটে। কিন্তু তবু তাদের জীবনে কেমন একটি সহজ স্বাভাবিক শ্রী আছে। জীবনের কি যেন একটা সহজ মন্ত্র তারা জানে। বাউরিদেব মত তাদের দারিদ্র্য কুৎসিৎ হয়ে ওঠেনা কখন। জীবনকে সুন্দর করে রাখতে বেশী কিছু উপকরণ ত' তাদের লাগে না। দুটো বনের ফুল, একটা বাঁশের বাঁশী, হাতে বোনা তাঁতেব একটা মোটা কাপড় কি শাড়ী, আর কিছু তাদের দরকার নেই। তাই দিয়েই তারা নিজেদের জীবনকে মধুর একটি সৌষ্ঠব দিতে পারে। পরিশ্রম আর অবকাশকে কি সহজ রঙীন ছন্দে তারা মিলিয়ে দেয়! জীবনের এ সহজ মন্ত্র তারা কোথা থেকে পেয়েছে কে জানে। কোন সুদূর সহজ এক বিস্মৃত সভ্যতার ধারা হয়ত আজও তাদের মধ্যে বইছে। সে সভ্যতায় উপকরণের বাহুল্য ছিলনা, ছিলনা নিবর্থক জটিলতা। সুদূর অতীতে কাঁকরপাহাড়ের রাঙামাটির দেশে যারা বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে 'ডলমেন' সাজিয়েছিল অজানা দেবতার উদ্দেশে, প্রথম যারা মাটির গভ থেকে তামা আঁচড়ে তুলেছে, পৃথিবীময় ছড়ানো ভুলে-যাওয়া সেই সভ্যতার বাহনেরাই হয়ত তাদের প্রথম দীক্ষাগুরু! কে জানে? সাঁওতাল মেয়েরা দূরের কমল'দ' থেকে জল নিয়ে আসছে। জলের কলসী তাদের মাথায় যেন ভার নয়, সুঠাম শরীরের একটা শোভন অলঙ্কার। জল তাদেরও দরকার, কিন্তু তাই বলে কেঁচোর মত নরম মাটি খুঁজে তারা আস্তানা গাড়ে না। জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে একটি সহজাত শুভবুদ্ধি তাদের আছে। তারা গ্রাম থেকে শুকনো উঁচু ডাঙা দেখে বাসা বাঁধে। মাটি আঁচড়ে জল পাবার জন্যে তারা ব্যাকুল নয়।

প্রথম প্রথম অমলের গ্রামের লোকের ওপর রাগ হয়েছে। এখনো তারা এই মৃত্যুবীজ-আকীর্ণ ধ্বসে যাওয়া গ্রাম ছেড়ে সুষণোডাঙ্গায় নতুন করে গ্রামের পত্তন ত' করতে পারে। সেখানে অবাধ আলো বাতাস; পচা ডোবার নিশ্বাসে আকাশ সেখানে বিষাক্ত হয়ে উঠবে না। কিন্তু অমল

আজকাল বোঝে গ্রামের লোকেরা কত নিরুপায়। এই আগাছার জঙ্গল, এই পচা ডোবা, নোনাধরা ইটের এই ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে তাদের জীবন অচ্ছেদ্য ভাবে মরণ-শৃঙ্খলে জড়ান। সে শৃঙ্খল তারা ছিঁড়তে পারবে না কোন দিন।

বাঁয়ে এবার শীতল বাঁধের দক্ষিণ পাড়টা দেখা যাচ্ছে। বিরাট উঁচু লাল মাটির সুদীর্ঘ স্তূপ। যুগযুগান্তের রোদ আর বৃষ্টিধারা তার ওপর স্থাপত্য চালিয়েছে। বিচিত্র এলোমেলো ছাঁদ ও খাদ! কাঁটা ঝোপ জন্মেছে এখানে সেখানে। কালের স্পর্শে মানুষের হাতের ছাপ গেছে মুছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন লম্বা পাথুরে ঢিবি,—ছোটখাট পাহাড়ের ভূমিকা।

মোহিত হঠাৎ বেশ একটু উত্তেজনার সঙ্গে অমলের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে বলে,—ওই দেখ, সেই মেয়েটা।

অমলের চোখেও তখন পড়েছে। বাঁধের পাড় যেখানে পশ্চিমে ঘুরে গিয়েছে সেখানে একটি ঢিবির ওপর মেয়েটি দাঁড়িয়ে। মুখ ভালো করে এত দূর থেকে দেখা যায় না, কিন্তু দেহের দীর্ঘ সুঠাম গড়নটি খুব বাঙ্গালী সুলভ নয়।

এই গ্রামের পক্ষে দৃশ্যটা এমন বিস্ময়কর যে গোড়াতে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার কথাই অমলের মনে হয়নি। মেয়েটিকে ঢালু পাড়ের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে নেমে আসতে দেখে, অমল জিজ্ঞাসা করে,—সেই মেয়েটি মানে,—কে, ও?

বাঃ, ওইত সেই বুড়োর মেয়ে—সামন্তদের সেই ভূতুড়ে ভিটেতে থাকে। জানো অমল দা, মেয়েটার ভয়ডর লজ্জা সরম নেই। যখন তখন একা একা সুষনোডাঙায় ঘুরে বেড়ায়।

মেয়েটি আজ কিন্তু একা আসেনি দেখা যায়। একটু দূরে বাঁধের পাড়ের একটা সহজ নামবার জায়গা দিয়ে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক নেমে আসছেন। মেয়েটি তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের

একটা হাত ব্যাণ্ডেজ করে কাঁধে বাঁধা শ্লিংএ ঝোলান। অমল বুঝতে পারে কাল হঠাৎ এই হাত ভাঙার দরুণই নিশ্চয় রাত্রে কুমুদ ডাক্তারের ডাক পড়েছিল। যাক কিছু গুরুতর ব্যাপার তাহলে নয়। কিন্তু বুড়োর সখ ত খুব! হাত ভাঙা অবস্থাতেও সকালে শীতল বাঁধে বেড়াতে এসেছে, তাও আবার বাঁধের পাড় বেয়ে ভেতরে ঢুকে! কি আছে এমন সেখানে দেখবার? সব শুকিয়ে শুধু মাঝখানে একটু জলার মত হয়ে আছে মাত্র। ভুবন বারুই তার আশে পাশে হেলায় ছেদ্দায় দুটো ধান বোনে ফি বছর।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং মেয়েটি তাদের পাশ দিয়েই চলে যায়। প্রৌঢ়ের শুকনো পাকানো চেহারা। বয়সের অনুপাতে সামর্থ্য কিন্তু অটুট আছে বলেই মনে হয়।

মেয়েটির সত্যিই লজ্জা সরম নেই। অসঙ্কোচে সে অমলকে বেশ ভালো ভাবেই পয্যবেক্ষণ করতে করতে যায়। লজ্জায় প্রথম চোখ নামাতে হয় অমলকেই। কিন্তু মোহিতকে দেখে মেয়েটি ও প্রৌঢ় দুজনেই একটু হাসে। মেয়েটি বলে,—আর যে আমাদের বাড়ি যাওনা—

মোহিত অত্যন্ত অপ্রস্তত ভাবে বলে,—যাব একদিন।

তারা একটু দূরে চলে গেলে অমল আর না জিজ্ঞাসা করে পারেনা,—তোমায়'ত ওরা চেনে দেখছি!

অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে মোহিত বলে,—হ্যাঁ একদিন গেছলাম ওদের বাড়ি। নিজের লজ্জাটা কাটাবার জন্যেই মোহিত আবার বলে,—জান অমলদা, মেয়েটার কি অদ্ভুত নাম—থিয়া। থিয়া আবার নাম হয় নাকি!

থিয়া নামটা অদ্ভুত বটে। মেয়েটিও ত সাধারণ নয়। তার চোখের ভুরুতে অচেনা বিদেশী টান, বিদেশী টান তার কথায়।

মোহিত তাদের বাড়ি গেছে। এ গাঁয়ে মোহিতের অজানা কিছু

থাকবার জো নেই। অমলের আরো অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু করে না।

আজ আবার সীধু খুড়োর সঙ্গে খানিক দূরেই দেখা, মাঠের মাঝে একটা ভাঙা শিবমন্দিরের চৌচির ভিৎটা শুধু দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে বোয়ান ঝোপের মাঝে টুকরো টাকরা পাথর ছড়ানো। সীধু খুড়ো সেখানে বসে আপন মনে কি বকছে।

এখানে বসে যে সীধু খুড়ো;—মোহিত জিজ্ঞাসা করে। তাঁতী-ঘর খুঁজতে এসেছিলাম রে, তাঁতীঘর! কাপড়টা বড় ছিঁড়ে গেছে কিনা। একটা কাপড় চাই।—সীধু খুড়ো আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

পথে যেতে যেতে মোহিত বলে,—সীধু খুড়ো ভুল কিছু বলেনি অমলদা। জানো ত এখানে পঞ্চাশ বছর আগেও অমন বিশ ত্রিশ ঘর তাঁতী, বিশ ত্রিশ ঘর তেলী ছিল। এখন দেখছ শুকনো বাঁজা ডাঙ্গা, তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু শীতল বাঁধের জলে এখানে সোণা ফলত। শীতল বাঁধও শুকিয়েছে, তারাও কোথায় উজাড় হয়ে গেছে…সীধু খুড়োর বয়সের সত্যি গাছ পাথর নেই—এখানে সে তাঁতীঘর দেখেছে সে কবেকার কথা।

মোহিত আরো অনেক কিছু বলে চলে। কিন্তু অমলের কাণে যায় কিনা সন্দেহ। অনেকক্ষণ থেকে সে অন্য কিছু একটা ভাবছে।

রাত পাহারার দলটা ভেঙে গেল। প্রভাত কদিনের জন্যে কলকাতা গেছল। ফিরে এসে একদিন বল্লে,—না রাত পাহারায় আর কাজ নেই। ও তুলে দাও।

তাই হল। রাত পাহারার বদলে সন্ধ্যে সকাল চৌধুরী বাড়ির বৈঠকখানায় আজকাল আড্ডা বসে।

এক রকম ভালোই হয়েছে। শীতের রাত্রে টহল দিয়ে বেড়াতে আর কদিন ভাল লাগে? তবে-- তবে একটু কথা আছে। ব্যাপারটার আরম্ভ

কি থেকে তা অনেকেই জানে, কিন্তু শেষটা সবাই অন্য রকম আশা করেছিল। চৌধুরী বাড়ির ছেলে হয়ে, প্রভাত, ভুবন বারুই-এর কাছে হার মেনে পিছিয়ে যাবে এটা কেউ আশা করে নি।

ভুবন বারুই ও তারই মত আরো জন কয়েককে কদিন ধরে রাত-পাহারায় দেখা যাচ্ছিল না। খবর পাঠালেও তারা দেখা করে না। দেখা করে গিয়ে বলে এলেও গায়ে মাখে না। জরিমানার ভয়েও না।

সবাই প্রভাতের জন্যেই অপেক্ষা করেছে তারপর। রাত পাহারার মতলব তারই মাথা থেকে বেরিয়েছে। সেই গাঁয়ের ইতর ভদ্র সব ঘর থেকে জোয়ান ছেলেদের একত্র করে এই দলটি গড়েছিল। দিনকাল খারাপ, নিজেদের ধন মান প্রাণ নিজেরাই সামলাবার জন্যে তৈরী হতে হবে,—এই কথাই সে সকলকে বুঝিয়েছে। গোড়ার দিকে সকলের কাছে সাড়াও পাওয়া গেছে ভাল। খানিকটা লজ্জা, খানিকটা চৌধুরী বাড়ীর সম্মান, আর বাকিটা জল খাবারের ঢালাও ব্যবস্থায় কারুরই এ ব্যাপারে উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি। তারপর প্রভাত কদিনের জন্যে গেছল কলকাতায় ফিরে। তখন থেকেই ভাঙন সুরু। প্রথমে ভুবন বারুই একাই কামাই করলে একদিন। তারপর মাঝি ও তেলিদের যে কজন দলে নাম লিখিয়েছিল, একে একে বিশু লোহার ছাড়া সবাই খসে পড়ল। ভুবন বারুই-ই নাকি শোনা গেল তাদের পাণ্ডা। সেই নাকি তাদের বুঝিয়েছে যে বাবুদের সঙ্গে অত দহরম মহরম ভালো নয়। বাবুদের প্রাণে সখ্ আছে তারা রাত জেগে গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াক্, গরীব ছোট লোকের ছেলেদের তা পোষায় না, ভালোও দেখায় না।

প্রভাত ফিরে এসে সব শোনে। বিভূতির সব বিষয়েই টেক্কা দেওয়া চাই। বল্লে,—নেহাৎ তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি, নইলে দুদিনে সিধে করে দিতে পারতাম। তখনই তোমায় বলেছিলাম ওদের অত আস্কারা দিও না—ওরা কি সেই জাত, লাথীর ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে!

প্রভাত এক এক করে সবাইকে একবার ডেকে পাঠালে। ভুবন বারুই ছাড়া সবাই এসে হেঁট মাথায় দেখা করে গেল। তাদের সবার কথাতেই বোঝা গেল রাত পাহারার জন্যে বিশেষ করে ছোট বাবুর কথায় তারা জান দিতে প্রস্তুত। তবে পঞ্চু তেলীর কদিন ধরে জ্বর আসছে রাত্রে, লক্ষণ মাঝি গেছল তার কুটুম বাড়ি, হাবু মাঝির ছোট ছেলেটা যায় যায়......অর্থাৎ সবারই কামাই করবার একটা না একটা গুরুতর কারণ আছে।

প্রভাত সবশুনে কিছু না বলেই তাদের বিদেয় করে দিল। বিশু লোহার বল্লে,—সব মিছে কথা ছোট বাবু, আপনি কিছু বলেন না তাই ওবাও জো পায়। বড় বাবুর কাছেই ওরা ঢিট্ থাকে।

প্রভাত একটু হেসে বল্লে,—তবে তুই আসিস্ কেন বলতে পারিস্!

আজ্ঞে আমার কথা আলাদা; আমি ত আর নেমকহারাম নই ওদের মত। সাতপুরুষ আপনাদের খেয়ে মানুষ, আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করলে ধর্ম্মে সইবে!

প্রভাত খুশী হ'ল কিনা বলা যায় না। অমলকে সঙ্গে নিয়ে পরেব দিন সে ভুবন বারুইএর বাড়ি নিজেই গেল।

গাঁয়ের এক প্রান্তে ভুবন বারুই-এর ঘর। অত্যন্ত নীচু একটা কুঁড়ে, পাশে একটা খোলা চালায় ঢেঁকিশাল। ছোট উঠানটায় দুটো ছাগল বাঁধা। গোটা তিনেক হাঁস তাদের আসতে দেখে উচ্চৈস্বরে ডাকতে ডাকতে পাশের জলায় গিয়ে নামল। সেখানে নীচু জমিতে বর্ষার জল এখনো শুকোয় নি। নোংরা উঠোনের মাঝখানে একটা বছর খানেকের হাড় পাঁজরা বেরুন লিকলিকে পেট মোটা ছেলে মাটির ওপরই রোদ্দুরে উপুড় হয়ে শুয়ে আপন মনে খেলা করছে। তার মাথা ও পিঠ ঢেকে একটা ছোট কাপড়ের টুকরো দোলাইএর মত করে' বাঁধা। তা ছাড়া গায়ে আর তার কিছু নেই। ভুবন আর তার বৌ উঠানের এক ধারে প্রকাণ্ড এক তাল মাটি তৈরী করছিল

ঘরের দেওয়াল সারতে। ভুবনের বৌ তাদের দেখে এক হাত ঘোমটা দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভুবন একেবারে তটস্থ হয়ে উঠে এল কাদা মাখা হাতে।—ছোট বাবু নিজে তার বাড়িতে আসবেন এ তার কল্পনার বাইরে। কি করবে সে ভেবেই পায় না।

কি লজ্জার কথা, আপনি নিজে কেন এলেন ছোট বাবু। আমি ত আজই যাচ্ছিলাম।

প্রভাত হেসে বল্লে,—তাতে আর কি হয়েছে। কিন্তু তোর ব্যাপারটা কি বলত!

ভুবন তখন ছোটবাবুর খাতির করতেই ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে নীচু দাওয়ার ওপর ঘর থেকে একটা তালপাতার চাটাই এনে পেতে দিয়ে বল্লে,—দেখুন ত! আপনাদের কি করে এতে বসতে বলি!

ছেলেটা তখন নতুন লোক দেখেই বোধ হয় কাঁদতে সুরু করেছে। বৌকে ধমক দিয়ে বল্লে,—যা নিয়ে যা এখান থেকে!

প্রভাত ও অমল চাটাইএর ওপর বসবার আগে গামছা দিয়ে চাটাইটা বার কয়েক ঝেড়ে, অকারণ খানিকটা ধুলো উড়িয়ে সে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে জানালে,—গরীবের ঘরে টুল চৌকি ত নেই, ছোট বাবুর এখানে বসতে কত কষ্ট হবে।

প্রভাত সরাসরি আসল কথাটাই আবার পাড়লে,—তুই কি রাত পাহারায় আর যাবি না ভুবন?

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে মাথা চুলকে ভুবন বল্লে,—আজ্ঞে যাব না কেন? তবে কি না……

তবে কি?—

আজ্ঞে, ওরা সব কি যে বলছে!

কি বলছে? কারা বলছে—বল?

ভুবন এবার যেন সাহস করে বলেই ফেল্লে কথাটা,—আজ্ঞে সবাই বলছে, রাত পাহারার দলে নাম লেখালে যুদ্ধে যেতে হবে!

যুদ্ধে যেতে হবে!—অমল ও প্রভাত দুজনেই এবার না হেসে পারলে না।—যুদ্ধে যেতে হবে কি রে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিশে নাকি সব নাম লিখে নিয়ে যাচ্চে,—দরকার হলেই যেখানে খুশী চালান করে দেবে। ওদের এখন অনেক লোক দরকার কিনা!

এবার তারা হাসতে পারলে না। খানিক গম্ভীরভাবে চুপ করে থেকে প্রভাত বল্লে,—তোদের কি আমাদের ওপর কিছু বিশ্বাস নেই ভুবন। যুদ্ধে যাবার ব্যাপার হলে তোদের কাছে আমি কি কথাটা লুকিয়ে রাখতাম!

আজ্ঞে না বাবু, তা কি আমরা জানি না।—ভুবন একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল,—আমি ত' সেই কথাই ওদের বলি। বলি, ছোটবাবু কি তেমনি মানুষ রে, যে ফাঁকি দিয়ে আমাদের যুদ্ধে পাঠাবে। তবু ওরা বলে কি জানেন?

কি বলে আবার? অমলই জিজ্ঞাসা করলে একটু রেগে।

প্রভাত বল্লে,—স্পষ্ট করেই কথাটা বলে ফেল ভুবন!

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলব বৈকি! আপনার কাছে বলবনা ত কার কাছে বলব। ওরা বলে যে, বাবুদের সখ হয়েছে, পাহারা দিয়ে বেড়াক, সারাদিন গতর খাটিয়ে আমাদের মিনিমাগ্না আবার রাত জেগে টহল দেওয়া কি পোষায়। তাছাড়া আমাদের কিই বা কার আছে যে পাহারা দিয়ে আগলাতে হবে।

কথাটা বলে ফেলে ভুবন অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে মুখ কাঁচুমাচু করে রইল।

অমল একটু রেগেই জিজ্ঞাসা করতে গেল,—'ওরা, ওরা' বলছিস 'ওরা' কারা বলত?

প্রভাত কিন্তু সে কথার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলো না। অত্যন্ত গম্ভীরমুখে অমলকে নিয়ে সে উঠে গেল।

ভুবন পেছন থেকে বল্লে,—আমার কোন অপরাধ নেবেন না বাবু! আপনি হুকুম করলে আমি আজই গিয়ে হাজিরে দেব।

প্রভাত সে কথার কোন উত্তর দিলেনা।

সবাই তারপর আশা করেছিল প্রভাত এর একটা বিহিত করবেই। কদিন ধরে তাকে যে রকম চিন্তিত দেখা গেছে তাতে সবাই ভেবেছে একটা কিছু মতলব সে নিশ্চয়ই ভাঁজছে। বলতে গেলে এটা একরকম চৌধুরী বাড়ির অপমান। প্রভাত যত ভালো মানুষই হোক এ অপমান গায়ে পেতে নেবে না!

কিন্তু সবাইকে অবাক করে প্রভাত একদিন দল ভেঙে দেওয়ার সঙ্কল্প জানিয়েছে। অনেকে আপত্তি জানিয়েছে। বিভূতি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—ছোট লোকের আস্পর্দ্ধার তাহলে আব সীমা থাকবে না। বাবুদের এর পর তারা আর তোয়াক্কা করবে? প্রভাত কারুব কথার প্রতিবাদ করে নি, কিন্তু মতও তার বদলায় নি।

প্রভাত সাধারণতঃ কথা বলে অত্যন্ত কম। এ ব্যাপার নিয়ে শুধু একটি মন্তব্য তার মুখে একদিন শোনা গেছে। অমল বুঝি রাত পাহারার দল সম্বন্ধে কি বলতে গেছল। প্রভাত গম্ভীর মুখে বলেছিল,—অষ্ট ধাতু যে আগুনে গলে মিশে যায়, খড়ের নুড়ো জালিযে তা হয় না। আমার সেইখানেই ভুল হয়েছিল!

অমল এ সম্বন্ধে আর কোন কথা কোন দিন বলেনি। প্রভাতের সঙ্গে অনেক বিষয়েই তার গরমিল, কিন্তু তবুও প্রভাতের জন্যে তার মনে খুব উঁচু একটি আসন পাতা আছে। এই একটি মাত্র লোকের কাছে নিজেকে ছোট বলে স্বীকার করতে তার লজ্জা নেই। প্রভাত, চৌধুরী

বাড়ির তিন ভাইয়ের সবচেয়ে ছোট এবং সকল দিক দিয়ে সে বাড়ি-ছাড়া। চৌধুরীদের জমিদার হিসাবে বদ্‌নাম নেই। তারা বিষয়বুদ্ধিতে পাকা, নরম গরম কি-ভাবে মিশিয়ে সংসারে চলতে হয় তারা জানে। বিশেষ করে বড় ভাই প্রকাশ চৌধুরী—যিনি আজকাল চৌধুরীদের বিষয় আশয় নিজে দেখেন,—গরীবের মা বাপ বলে তাঁর একটা সুখ্যাতিই আছে। দান ধ্যান তাঁর যথেষ্ট, নিজেদের খরচায় গাঁয়ে একটা বাংলা স্কুল তিনি বসিয়েছেন। বৎসরে বার কয়েক পূজোয় পার্ব্বণে আশপাশের অনাথ আতুর কাঙালীরা শ্যামসুন্দরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে পেট ভরে ভালোমন্দ খেয়ে চৌধুরীদের জয় গান করে যায়। মেজ ভাই প্রতাপ চৌধুরী বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসে কলকাতাতে প্র্যাক্‌টিস করেন,—গাঁয়ে কচিৎ কদাচিৎ উৎসবে অনুষ্ঠানে তাঁকে আসতে দেখা যায়। কিন্তু বিলেত ফেরৎ হয়েও তাঁর এতটুকু সাহেবী নেই, না বেশভূষায় না চালচলনে। গাঁয়ের লোক তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ। দেশের বাড়িতে এসে তিনি আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাত গোত্র সকলের খোঁজ নেন, নিজে থেকে আগে সকলের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। অদ্ভুত তাঁর স্মরণশক্তি, আশ্চর্য্য তাঁর সকলের উপর টান। হয়ত রবিদের বাড়ি গেছেন। তারা আসন পেতে দেওয়ার আগেই দাওয়ার ওপর ধূলোয় বসে পড়েন। বাড়ির সকলেই তখন শশব্যস্ত। বড়রা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেমেয়েগুলো একদিকে জড় হয়ে হয়ত সসম্ভ্রমে তাঁকে দেখছে, পাৎলা ছিপ্‌ছিপে শ্যামবর্ণ একটি ফ্রকপরা মেয়েকে তার মধ্যে ডেকে আদর করে তিনি বলেন,—বল দেখি ভেলী, এবার আমায় পছন্দ হচ্ছে ত! ভালো করে দেখ। বয়সটা আমার সব এবার কলকাতায় ছাঁটিয়ে এসেছি! চুল গুলো সব কলি-ফেরান। ভেলী এখন একটু বড় হয়েছে। ঠাট্টার মানে বোঝে। লজ্জায় এতটুকু হয়ে পালাতে পারলে

সে বাঁচে। সকলের মধ্যে হাসির ধূম পড়ে যায়। বাবা! মেজ বাবুর এতও মনে থাকে! ভেলী রবির ভাগ্নী, সম্পর্কে মেজবাবুর নাতনী। বছর দুই আগে এমনি একদিন এ বাড়িতে বেড়াতে এসে তাকে হাত পা ছুঁড়ে বায়না করে কাঁদতে দেখে তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন,—কাঁদিস্‌নি কাঁদিস্‌নি, তোকে বিয়ে করে নিয়ে যাব, দেখ না। ভেলী তখন ছ সাত বছরের মেয়ে। রাগের মাথায় বলেছিল,—তোমায় বিয়ে করতে বয়ে গেছে,—তুমি ত বুড়ো। মেজবাবু হেসে বলেছিলেন,—বটে! আচ্ছা দাঁড়া এবার কলকাতায় কি রকম বয়স ভাঁড়িয়ে আসি দেখবি। দুবছর বাদেও সে কথা মেজবাবুর মনে আছে—ভেলীর নামটা পর্য্যন্ত!

শুধু কি ভেলী, মেজবাবুর সকলের কথা মনে থাকে,—সকলের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর। প্রত্যেক বার ফিরে যাবার সময় তিনি দুঃখ করে যান—নেহাৎ পেশার দায় তাই, নইলে দেশ ছেড়ে সেই কলকাতা থাকতে কি ভালো লাগে।

প্রভাত ভায়েদের থেকে একেবারে আলাদা। সেজ ভায়ের মত মিশুক সে নয়, মানুষকে সহজে আপনার করার কোন কৌশল সে জানে না, আবার বড় ভাইয়ের মত স্বাভাবিক দুর্লঙ্ঘ্যতাও তার চারিপাশে নেই। আর দু ভাই জীবনে ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিলেও সুনির্দ্দিষ্ট একটি ধারা অনুসরণ করে এসেছেন। তাঁরা বংশের প্রাচীন গৌরবের কথা ভোলেন নি, আধুনিক কালের দাবীকেও অস্বীকার করেন নি। পৃথিবীতে তাঁদের জায়গা যে কোথায় এবং তাঁদের সার্থকতা যে কিসে তা তাঁরা ভাল করেই জানেন। সবশুদ্ধ জড়িয়ে তাঁদের চরিত্র ও জীবনের তাই একটি স্পষ্ট রূপ আছে, কিন্তু প্রভাত যেন এখনও হাতড়ে ফিরছে। মত ও পথ কিছুই যে সে বাছাই করে উঠতে পারছে না। তার এই হাতড়ে বেড়ানোর আন্তরিকতাই অমলকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে। তার নিজের

ভেতরও হয়ত এমনি একটি অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্ব আছে। তবে প্রভাতের মত সে দ্বন্দ্ব এত তীব্র —তার প্রকাশ এমন উগ্র নয়। প্রভাত এ পর্য্যন্ত অনেক কিছু করেছে এবং যখন করেছে তখন চরম ভাবেই করেছে। সে খদ্দর পরেছে, জেলে গিয়েছে, লাঠি খেয়েছে, তারপর সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিনকতক শুধু পড়াশুনায় মন দিয়েছে। কিন্তু কলেজের পড়া বেশী দিন সে করতে পায়নি। আবার নতুন এক প্রেরণা নিয়ে নতুন এক আন্দোলনে নেমে ফ্যাক্টরিতে, কারখানায়, মজুরদের বস্তিতে বস্তিতে বক্তৃতা দিয়ে বেরিয়েছে, যথারীতি মার খেয়েছে ও জেলে গিয়েছে। এবারে জেল থেকে ফিরে সে কিন্তু বদলে গেছে আবার। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেকদূর এগিয়েছে। প্রভাত কোন আন্দোলনে আর যোগ দেয়নি। সুবোধ ছেলের মত গ্রামে ফিরে গেছে। কিছুদিন আগে সে বাড়ি থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করেছিল। জমিদারীর এক কপর্দ্দক সে স্পর্শ করবেনা এই ছিল নাকি তার সঙ্কল্প। এবার দেখা গেছে সে-সব পাগলামি তার নেই। দাদারা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাঁরা বুঝেছেন রোগ প্রায় কেটে গেছে। রাত পাহারার দল গড়ার মত একটু আধটু উপসর্গকে তাই বড় বাবু প্রকাশ চৌধুরী প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। রাত-পাহারার দল প্রভাত নিজেই ভেঙে দিতে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছেন। মাঠ বন ভেঙে সবাইকে একদিন বাঁধা রাস্তা ধরতে হয়।

কিন্তু সত্যি কি প্রভাত চৌধুরী এবার বাঁধা রাস্তায় পা বাড়াচ্ছে! আঁকা বাঁকা নানা রাস্তা খুঁজে সে কি শেষ পর্য্যন্ত চৌধুরীদের ধারাতেই গিয়ে মিশবে?

প্রভাত আজকাল শুধু অমলকে সঙ্গে নিয়ে এক একদিন বেড়াতে বেরোয়। সেদিন শীতলবাঁধের কাছে গিয়ে সে আর যেতে চায়নি। বাঁধের পাড়ের ওপর অনেকক্ষণ চুপ করে এক জায়গায় বসে থেকে উঠে

আসবার সময় হঠাৎ বলেছিল,—দেড়শ বছর ধরে এই শীতলবাঁধ মজে গেছে। এ বাঁধের ওপর তাদের কি দাবী ছিল গাঁয়ের লোকের মনেও নেই। খানিক বাদে সে আবার বলেছে,—নতুন ওষুধ যে চালাতে চায় নিজের ওপর পরীক্ষা করবার সাহস তার আগে চাই!

অমল প্রভাতের কথার সূত্র ঠিক ধরতে পারেনি, কিন্তু জিজ্ঞাসাও করেনি। ফেরবার পথে সেদিনই বুঝি আবার থিয়া আর তার বাবার সঙ্গে দেখা। নরেশ্বর বাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিলেন,—এ কদিন তোমায় দেখিনি ত অমল, এখানে ছিলে না নাকি!

থিয়া হেসে বলেছিল,—ছিলেন নিশ্চয়, তবে বোধ হয় সাপের ভয়ে যান নি।

হ্যাঁ, থিয়াদের সঙ্গে অমলের ইতিমধ্যে আলাপ হয়েছে। সেখানে যাতায়াতও করেছে মাঝে মাঝে। আরো অনেকেই যায় আজকাল। চৌধুরী বাড়ির আড্ডাটাই ক্রমশঃ যেন ভেঙে যাচ্ছে। সামন্ত ভিটের চালচলন নিয়ে গাঁয়ে অবশ্য বেশ একটু আন্দোলন সুরু হয়েছে,—নরেশ্বর বাবুর ইতিহাস কিছু কিছু আজকাল সবাই জানে। দু পুরুষ তাঁরা নাকি বর্মায় কাটিয়েছেন, যুদ্ধের জন্যে শেষে বাধ্য হয়েছেন পালিয়ে আসতে। পুরোপুরি বাঙালীও নাকি তাঁরা নন। থিয়ার মা অন্ততঃ বাঙালী ছিলেন না। মেয়েটারও তাই নাকি অমনি বেয়াড়া বেহায়া,—গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। এই হ'ল গাঁয়ের ধারণা। নিজেদের মাথা বাঁচাবার কোন ব্যাকুলতা কিন্তু ছেলেদের দেখা যায় না। তারা প্রায় সবাই নানা ছুতোয় সেখানে যায়। অমলও গেছে কয়েক বার।

অবশ্য সাপের ভয়ে সেখানে যাওয়া সে বন্ধ করে নি। একদিন আর একটু হলে একটা খরিশের ঘাড়ে পা দিয়েছিল বটে। সেদিন গল্প করতে করতে একটু রাত হয়ে গেছল, পোড়ো ভিটের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায়

যাবার পথটা থিয়াই আলো দেখিয়ে এগিয়ে দিতে এসেছিল। অমল একটু সামনে ছিল, থিয়া আলো নিয়ে পেছনে। হঠাৎ থিয়া পেছন থেকে জামা ধরে তাকে সজোরে টেনে চিৎকার করে উঠেছিল,—সাপ সাপ !

বেশ বড় একটা খরিশ। একটা পা বাড়ালেই আর বোধ হয় রক্ষা ছিল না। সাপটা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছিল বোধ হয়। আলো দেখে সে স্থির হয়ে গেল।

কয়েকটা উদ্বিগ্ন মুহূর্ত্ত! থিয়া তাকে সভয়ে জড়িয়ে আছে। কঠিন বাহুবেষ্টনে দ্রুত নিশ্বাস-পতনে থিয়ার বুকের ওঠানামা অমল টের পাচ্ছিল, তার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সবল হাতুড়ি পেটার শব্দ;—কিন্তু সেটা তার, না থিয়ার, আলাদা করে বোঝা যায় না।

খানিকটা স্থির হয়ে থেকে সাপটা আবার ধীরে ধীরে পোড়ো ভিটের জঙ্গলের ভেতর চলে গেছ্‌ল।

থিয়ার চিৎকারে নরেশ্বর রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, —কি হয়েছে কি!

অমলকে ছেড়ে দিয়ে থিয়া উত্তেজিত ভাবে বর্ম্মী ভাষাতেই বুঝি কি বলেছিল। নরেশ্বর হেসে বলেছিলেন,—যাক্ চলে গেছে ত' আর ভয় নেই! বাধা পড়েছে যখন তখন আর একটু বসে যাও অমল।

অমল আপত্তি করেনি, ফিরে এসে বলেছিল,—এরকম জায়গায় বাস করা আপনাদের উচিত নয়। কত কালের পুরোণো পোড়ো বাড়ি, এ ত সাপখোপেরই রাজত্ব—পদে পদে এখানে বিপদ হতে পারে।

ঠাট্টা করে তারপর বলেছিল,—তাছাড়া নরহরি সামন্তর ওপর সাপেদের আক্রোশ ত আছে!

অকস্মাৎ নরেশ্বরের মুখের চেহারা অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে, গলার স্বর অত্যন্ত কঠিন রুক্ষ হয়ে উঠেছে,—নরহরির কথা তুমি কি জান?

কেন যে এই নিরীহ ভালোমানুষের বদমেজাজি বলে প্রথম দুর্নাম রটেছিল অমল যেন বুঝতে পেরেছে। নরেশ্বর কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে হেসে বলেছেন,—'নরহরির' বড়ি থাকতে আমাদের সাপের ভয় কি?

নরহরির বড়ির কথা আপনিও শুনেছেন দেখছি!—অমল একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলেছে,—কিন্তু জানেন ত, সাপুড়ে ওঝারা যা দেখায় সব বুজরুকি! সাপের বিষের সত্যি কোন ওষুধ নেই।

থিয়া হঠাৎ হেসে ফেলেছে, অমল অবাক হয়ে তার দিকে চাইতে হাসি থামিয়ে বলেছে,—সাপে কামড়ান ভাল নয়, মাঝে মাঝে সাপ দেখা কিন্তু ভাল!

অমল তারপর যাবার জন্যে উঠে পড়েছে। নরেশ্বর বলেছেন—খাতাটা কিন্তু আর একদিন মনে করে এনো ঠিক।

নরেশ্বরের এখানে এসে এক বাতিক হয়েছে, সামনবেড়ের যত প্রাচীন পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করা। অমলরা চৌধুরীদের দৌহিত্র বংশ। অমলের প্রপিতামহ ব্রজবিনোদ রায় চৌধুরীবাড়ির প্রথম বৈষ্ণব রাম-দয়াল চৌধুরীর একমাত্র মেয়ের ছেলে। তিনি মাতামহের যা বিষয় পেয়েছিলেন নিজের চেষ্টায় ও কৃতিত্বে তা বহুগুণ বাড়িয়ে শেষ পর্য্যন্ত চৌধুরীদেরও নাকি টেক্কা দেবার উপক্রম করেছিলেন। মাতুলদের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা পর্য্যন্ত তাঁর চলেছিল। কোম্পানির আমলে তিনি এ অঞ্চলের প্রথম দারোগা হন। অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল বাঘা বক্সী। কিন্তু শারীরিক বল ও সাহস ছাড়াও তাঁর অনেক গুণ ছিল। তখনকার দিনে তিনি একটি খাতায় প্রতিদিনের খবর লিখে রাখতেন। গাঁয়ের বড় বড় ঘরের কুলজিও তিনি নাকি তৈয়ারী করেছিলেন। অমল প্রাচীন একটা সিন্দুক ঘাঁটতে ঘাঁটতে একদিন সেই রোজনামচা ও কুলজির দুটো ছেঁড়া পাতা পেয়েছিল। নরেশ্বরের কাছে একদিন সে কথা বলায় তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে সেগুলি চেয়েছেন।

খাতা আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অমল চলে আসছিল। এবারেও থিয়া আলো হাতে তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ হেসে বলেছিল,—না, আপনার সঙ্গে যেতে সাহস হয় না। আবার যদি সাপ বেরোয়!

তারপর সত্যি সত্যি বস্মি চাকরটাকে ডাকিয়ে সে তাকে আলো নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসতে হুকুম করেছিল।

অমল কয়েক পা যেতে না যেতেই কিন্তু পিছন থেকে ডেকে বলেছিল,—শুনুন!

অমল ফিরে দাঁড়িয়েছিল অবাক হয়ে।

আমি ভেবেছিলাম যে রকম সাপের ভয়, আজ আপনি এখানেই থাকতে চাইবেন।

থিয়া সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকিয়ে। তার দৃষ্টিতে দুবোধ কৌতুকের ঝিলিক্। অমল আরক্ত মুখে কিছু না বলেই চলে এসেছিল।

চাতক পাখীদের ডানা অক্লান্ত। ঝাঁকে ঝাঁকে শুধু যেন আকাশ ফেনিয়ে তোলার উল্লাসে ধনুকের মত বাঁকান পাখায় তারা শূন্যে অবিরাম চক্কর দেয় পরস্পরের পিছু পিছু। এ যেন মুক্ত পাখার ছন্দে অপরূপ সন্ধ্যাবন্দনা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ আরো গাঢ় হয়ে আসে। চাতক পাখীর ঝাঁকও একে একে চৌধুরী বাড়ির রাসমঞ্চের ওপরকার চূড়ার ফোকরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গাঢ় অন্ধকারে এখানে সেখানে একটা দুটো জোনাকী যেন রাত্রির হৃদ-স্পন্দনের মত দপ্ দপ্ করে। কোথায় দূরে, থেকে থেকে বাউরি পাড়ার ঢোলকের শব্দ। 'কান্না - কারা-কারা'—কার হাঁস বুঝি এখনো ঘরে

ফেরেনি সে ডেকে সারা হচ্ছে। সে সমস্ত শব্দও গাঢ় নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ধীরে ধীরে যেন শুষে নেয়। অনেকক্ষণ ধরে ছাদের ওপর অমল একা। সুদূর ছায়াপথ থেকে যেন একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস খিড়কি পুকুরের অশথ গাছের পাতাগুলোকে একটু কাঁপিয়ে চলে যায়…

মঞ্জরী আলো নিয়ে ওপরে উঠে এসেছে,—তুমি অন্ধকারে ছাদে বসে আছ, আর আমি খুঁজে সারা হচ্ছি। কি ব্যাপার বল ত! খেতে যেতে হবে না।

মঞ্জরী আলোটা নামিয়ে রাখে। নামহীন বেদনার বিরাট সীমাহীন রাত্রি ওই আলোয় ঘেরা ছাদটুকুতে আবার সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

চ, যাচ্ছি,—বলে অমল উঠে পড়ে। সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মঞ্জরী আগে আগে আলো দেখাতে দেখাতে নামে।

মাথায় তুই কি তেল মাখিস্ বল ত?—অমল জিজ্ঞাসা করে।

কি আর মাখব, যা যখন পাই।

আচ্ছা এবার একটা ভালো তেল তোকে এনে দেব—অমল কথা দেয়।

সীধু খুড়ো এক একদিন হঠাৎ চৌধুরী বাড়ির আড্ডাতে এসে হাজির হয় বলে,—দে দেখি একটা খবরের কাগজ। যুদ্ধুটার কি হল দেখি?

বিভূতি হয়ত হেসে বল্লে,—যুদ্ধের আর কাগজে কি দেখবে সীধু খুড়ো, চোখেই দেখতে পাবে এবার।

সীধু খুড়ো অন্যমনস্কভাবে খানিক এক দিকে তাকিয়ে থেকে বলে,—কিন্তু যুদ্ধু আমি করব না।

সবাই এবার হেসে ওঠে।

সে কি কথা সীধু খুড়ো। তুমি না যুদ্ধু করলে আমাদের উপায় কি।

না,—যুদ্ধু আমি কিছুতেই করব না। সবেগে মাথা নেড়ে সীধু খুড়ো হঠাৎ উঠে চলে যায়। খবরের কাগজের কথা তার মনেই নেই।

সবাই হাসতে থাকে। বাইরে খানিকবাদে যথারীতি সীধু খুড়োর বেসুরো গান শোনা যায়—

যতই খোঁচা দিস্ না কেন—
কিছুতে করব না লড়াই,
এমন হারা হারব এবার
ভাঙবে তোর ওই জোরের বড়াই।

রবিই বুঝি হেসে বলে,—যাক্ সীধু খুড়োর একটা গানের তবু মানে পাওয়া গেল।

সীধু খুড়োর খুব কম গানেরই কিন্তু মানে পাওয়া যায়। কোন দিন হয়ত সে সন্ধ্যাবেলা অমলদের বারবাড়িতেই একটা শালপাতার পাত পেতে নিয়ে বসে। প্রতিদিন কোন না কোন বাড়িতে এমনি পাত পেতে বসা তার দস্তুর। পাতটা সে নিজেই যত্ন করে সুষণোডাঙা থেকে শালপাতা কুড়িয়ে তৈরী করে আনে, কিন্তু মুখ ফুটে কোথাও খাবার কথা বলতে কেউ তাকে শোনে নি। বেশীর ভাগ বাড়ি থেকেই তাকে ফিরতে হয় না! অনেকে ভয়ে-ভক্তিতে বেশ একটু যত্ন করেই খাওয়ায়—মঞ্জরী তাদের মধ্যে একজন।

খেতে খেতে সীধু খুড়ো বলে,—একটা নতুন গান বেঁধেছি শুন্‌বি।

জবাবের অপেক্ষা না করেই সে গান ধরে,—

হাত বাড়ালে পাতে ভাত,
পা বাড়ালে রাস্তা.
পিঠ দেখালেই চাবুক দিয়ে
চাপাস্ চিনির বস্তা।
—কি তোর আজব বিধান।

কুমোর পোকাটা মুখে মাটি নিয়ে জানালার পাল্লা থেকে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত চারিদিকে বাসা বাঁধবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। শীত যায় যায় তারই খবর এই প্রথম কুমোর পোকার গুঞ্জনে। খিড়কি পুকুরের অশথ গাছটার শুকনো ঝরা পাতায় ঘরদোর উঠোন ছেয়ে গেল। কটা পাতা ঘুরতে ঘুরতে অমলের ঘরেই এসে পড়ে। শীতের দিন সত্যি ফুরিয়ে এসেছে। সুষণোডাঙা থেকে এখনই দুপুরে মাঝে মাঝে কেমন একটা উন্মনা দমকা হাওয়া এসে সব কিছু নাড়া দিয়ে যায়।

গাঁয়ে অনেক কিছু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। মোহিত একদিন পালিয়ে গেছে কলকাতায়। স্যাকরা বাড়ি থেকে মঞ্জরীর চুড়ি কগাছা পালিশ করিয়ে আনতে গিয়ে আর ফেরে নি। কি বিপদই না হয়েছিল! সেই রাত্রেই মঞ্জরীর বিয়ে। অমলের মা নিজের চুড়ি কগাছা খুলে দিয়েছিলেন। এমন বিয়ের সম্বন্ধটা নইলে ভেঙে যাবে। অমলের মার মন সত্যি অনেক উঁচু।

মঞ্জরীর বিয়েটা হল ভারী আশ্চর্য্য ভাবে। সকাল বেলাও কেউ কিছু জানে না। মঞ্জরী প্রতিদিনের মত সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করেছে —গাই দুয়েছে, ভাঁড়ার বার করেছে, সবাইকে চা জলখাবার করে খাইয়েছে, সরকারী পুকুরের মাছের ভাগ বুঝে নিয়েছে, হেঁসেলে রান্নায় বসেছে!

কুমুদ ডাক্তারের মেয়ে মমতার সেই দিনই বিয়ে। মমতা মঞ্জরীর ছেলে বেলার সই। দুপুরে সকলের খাওয়া দাওয়া হলে মঞ্জরী বিয়ের কনেকে দেখতে গেছল। ঘণ্টা খানেক বাদে নিজেই তাকে বিয়ের কনে হতে হবে কে জানত!

পাড়াগাঁয়ের বিয়ে। বরপক্ষ আগের দিন রাত্রেই গ্রামে এসেছিল। অমলদের বার দালানেই তাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। বরপক্ষে কর্ত্তা হয়ে এসেছিলেন বরের এক বড় জ্যাঠতুত ভাই। একটু বয়স হয়েছে।

প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর অনেক পেড়াপীড়িতেও আর বিয়ে করেন নি আত্মীয় স্বজন একরকম আশা ছেড়েই দিয়েছিল তাঁকে রাজী করাবার মঞ্জরীর মার অবস্থা সবাই জানে। তার ওপর দয়া করে কুমুদ ডাক্তা নিজেই বুঝি গরীবের মেয়েকে উদ্ধার করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, নেহাৎ ভাসাভাসা অনুরোধ। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ভদ্রলোক এক কথায় রাজি হয়ে গেছেন। মঞ্জরীকে ইতিমধ্যে তিনি কুমুদ ডাক্তারের বা যাতায়াত করতে দেখেছিলেন কিনা কে জানে, কিন্তু মেয়ে দেখবারও তিনি নাম করেন নি।

মোহিত গয়না নিয়ে ফিরে না আসায় বেশ একটু গোল বেধেছিল অবশ্য। কিন্তু অমলের মার অনুগ্রহে সব ঠিক হয়ে গেছে! বিয়েব প দিনই মঞ্জরী চলে গেছে স্বামীর সঙ্গে। তার সই মমতা শ্বশুর বাড়ি যেতে কেঁদে ভাসিয়েছে কিন্তু মঞ্জরীব চোখে এক ফোঁটা জল কেউ দেখেনি। তবু মমতার ত বলতে গেলে কাছেই শ্বশুর ঘর। একদিনে যাওয়া আসা হয়। আর মঞ্জরীর স্বামী চাকুরী করে সুদূর বিদেশে—সেই আসামে কোন চায়ের বাগানে। কালে ভদ্রেও কখন আসতে পারবে কিনা সন্দেহ। সবাই অবাক হয়ে গেছে তাই মঞ্জরীর ব্যবহারে। এ সংসারে পাখীটা পোকাটা পর্য্যন্ত যার অত আপনার ছিল সে অমন করে সব মায়া এক মুহূর্ত্তে কাটায় কি করে!

আর সকলের সঙ্গে যাবার সময় অমলকেও মঞ্জরী প্রণাম করে গেছল। পায়ের ধূলো নিয়ে হেসে বলেছিল,—তোমার কাছে আমার একটা কিন্তু পাওনা আছে অমলদা।

অমল হেসে বলেছিল,—খুব হিসেবী মেয়ে ত! যাবার আগে যত পাওনা গণ্ডা বুঝি বুঝে নিচ্ছিস! কি আবার পাওনা ছিল তোর?

একটা মাথার তেল! মনে আছে বোধ হয়।

অমল হেসে ফেলেছিল ;—আচ্ছা, খুব লজ্জা দিয়েছিস! সত্যি একেবারে ভুলে গেছলাম।

মনে করিয়ে দিলাম এখন একটা কিনে পাঠাবে ত!

অমল সকৌতুকে বলেছে,—তেল কিনে পাঠাব সেই আসামে! আমি তেল না পাঠালে তুই রুক্ষ চুলে থাকবি নাকি!

তাই যদি থাকি!—বলে হেসে মঞ্জরী চলে গেছল।

গাঁয়েব আরো নতুন খবর আছে বইকি! বিভূতি ঘোষ বসে থাকবাব ছেলে নয়। সে একটা বিড়ির ফ্যাক্টরি করেছে গাঁয়ে। খুব ভালোই চালাচ্ছে। মাঝি বাউরির ছেলেগুলোর একটা হিল্লে হয়েছে। ক্ষেত খামারের কাজে এখন তাদের পাওয়া দায়। বডীন গেঞ্জি পরে বিড়ি ফ্যাক্টরীর আটচালায় বিড়ি পাকানই তারা পছন্দ কবে বেশী।

সাঁধু খুড়োকে কিছুদিন থেকে আর দেখা যাচ্ছে না। কদিন আগে তার এক নতুন পাগলামি হয়েছিল,—যখন তখন,—পেয়েছি! পেয়েছি! বলে চীৎকার করা। তারপর সে একেবারে নিরুদ্দেশ।

আরো খবর আছে। চৌধুরীদের নামে থিয়ার বাবা নরেশ্বর মামলা করেছেন, শীতলবাঁধের স্বত্ব দাবী করে। তিনিই নাকি সামন্তদের শেষ বংশধর।

অমলরা বোধহয় সামনবেড়ে ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। ব্রজবিনোদ রায়ের রোজনামচার ছেঁড়া খাতাটা মোহিতকে দিয়ে অনেকদিন আগে নরেশ্বর বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো ফিরিয়ে আনতে, একদিন থিয়াদের বাড়ি যাবে ভেবেছিল, কিন্তু আর এখন যাওয়া চলে না।

———

৪-৬২